দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২৪ তম সংখ্যা ❖ ২ মার্চ ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- মাতৃভাষা বাংলা ২
- ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ৪
- বঙ্গ বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন ও বঙ্গ বাজেট সবই মায়ার খেলা ৭
- সংখ্যালঘু উন্নয়নের পথরেখা ৯
- নয়া-ফ্যাসিবাদ একটি নোট ১১
- ভারতে ফ্যাসিবাদ চিনে নেওয়া এখন না হলে, তাহলে কখন ? ১২
- শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি : ঋত্বিক ঘটক এক অনন্য প্রতিভা ১৫
- স্মরণ : গানের গেরিলাযোদ্ধা ১৭
- সাম্প্রদায়িক ট্রল ব্রিগেডকে জাভেদ আখতার অসাধারণ জবাব দিলেন ১৮
- মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে হবেন তা সর্বদা প্রধানমন্ত্রী মোদীই ঠিক করবেন ১৯
- ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর পুঁজিবাদী সংকটের গভীরতা বৃদ্ধি ২০
- মার্কিনী অর্থ মোদীর ঘরে– মোদীর মুখোশ খুলে দিল তারই বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প ২১
- বাংলাদেশে এবারের মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ২২
- এপার বাংলায় স্মরণ ভাষা শহীদদের ২৪
- নরেন্দ্র মোদীর আস্ফালনের পতন ২৫

কেন্দ্রীয় শহিদমিনার, বাংলাদেশ
(Central Martyr Minaret, Bangladesh)

➲সম্পাদকীয়

চার বছর হয়ে গিয়েছে , দেশের জনগণনা বন্ধ

কুম্ভ মেলা সমাপ্ত হয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি, এই মেলা সমাপ্ত হয়েছে। ভারত সরকার ও উত্তর প্রদেশ সরকার দাবি ও প্রচার করেছিল এবারের মেলা মহাকুম্ভ মেলা , যা নাকি ১৪৪ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ ১৪৪ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮১ সালে বিগত মহাকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সারা দেশের মিডিয়া এই দাবি ও প্রচারকে তুঙ্গে তুলেছিল। অথচ পৌরাণিক কোনও গ্রন্থে এই দাবির স্বপক্ষে কোনও লেখাপত্র কেউ খুঁজে পেয়েছেন বলে এখনও পর্যন্ত দাবি করেন নি। ১৮৮১ সালে ভারতের বিরাট অংশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও এলাহাবাদ অর্থাৎ প্রয়াগ ছিল ব্রিটিশদের অধিকারে। তাদের কোনও প্রশাসনিক রিপোর্টে ওখানে হিন্দুদের একটি মহাকুম্ভ মেলা ১৪৪ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এরকম কিছু রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায় নি। সরকার ও রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির প্রচার ছিল এবার নাকি গ্রহ নক্ষত্র সমূহ সব এমন অবস্থানে এসে পড়বে, যা আবার আসবে ২১৬৯ সালে। এই দাবির পিছনে কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানী সংস্থার কোনও পর্যবেক্ষণ ছিল না।১৪৪ বছর পর আমরা কেউ বেঁচে থাকবোনা। তাই মহাকুম্ভে স্নান করে অখন্ড পূণ্য লাভের প্রত্যাশায় বিরাট সংখ্যক মানুষ এবার

প্রয়াগে গিয়েছিলেন। এই মহাকুম্ভ সরকারি ব্যবস্থায় দুই ভারতবর্ষ দেখলো। এক আম জনতার ভারতবর্ষ , আর এক ভিআইপি ও ভিভিআইপি -- দের ভারতবর্ষ। আম জনতাকে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে সঙ্গম স্থলে পৌঁছে স্নান করতে হয়েছে।পদপিষ্ট হয়ে সঙ্গমের পথে , এমনকি ৬০০ কি.মি দূরে রাজধানীর রেল স্টেশনে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গমে সাধারণের স্নানের ঘাটে জল ছিল দূষিত। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে , পথ দুর্ঘটনায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই চরম অব্যবস্থার কথা যাঁরা বলেছেন তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শুয়োর ও শকুন বলেছেন।

সরকার দাবি করেছেন এই মহাকুম্ভতে প্রয়াগে নাকি ৬৭ কোটি মানুষ এসেছিলেন। এই উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য গণনা করেছেন এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার (পড়ুন কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশ)। যাঁরা ২০২১ সালে প্রাপ্য জনগণনা অর্থাৎ আদমশুমারি (Cencus) এই ২০২৫ সালেও শুরু করতে পারেনি। অথচ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই জনগণনা ছিল আবশ্যিক। তা না করে তাঁরা গুণে ফেললেন মহাকুম্ভতে কত লোক এসেছিল ! ধর্মান্ধতার উনুনে হাওয়া দেওয়ার জন্য এইসব প্রোপাগান্ডা এদের করতেই হত। তাই করা হয়েছে।

সম্পাদক
শান্তনু দত্তচৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

মাতৃভাষা বাংলা

শুভ বসু

বাংলাভাষার শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে ১৯৯৯ সালে উনেস্কো বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মাতৃভাষা যেখানেই আক্রান্ত সেখানেই ২১ ফেব্রুয়ারীর স্মৃতি অনুরণন তোলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময়ে এই আন্দোলন সূচিত হয়। চৌধুরী খালিকুজ্জামানের হায়দরাবাদে একটি ভাষণের মধ্যে এই আন্দোলনের সূচনা। বাঙালি মুসলমানের মুখের জবান কি এই বিতর্ক বহুদিনের। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বৎসর গ্রন্থে বলেছিলেন ময়মনসিংহে মৃত্যুঞ্জয় উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি দাবি তোলেন যে ঈদের মাহফিল করা হবে। অনেক করে বিদ্যালয় কতৃর্পক্ষকে রাজি করানো হয়। এই উচ্চ বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো হত, কিন্তু ঈদের কোনো উৎসব হত না। ফলে আবুল মনসুর আহমদের দাবি মেনে ঈদের অনুষ্ঠান হল। কিন্তু সেখানে বক্তৃতাটি পাঠের সময়ে গোলমাল শুরু হল, কারণ সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা চান না বাংলায় বক্তৃতা হয়। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ তাঁর জেদ ধরে রইলেন। আবুল মনসুর সাহেব বিদ্যালয়ে পড়া কালে সবকিছু বাংলায় বলা শুরু করেন। ফুটবল কে বলতেন চর্মগোলক , রেফারি কে বলতে সালিশ। আসলে বাংলা ভাষার সঙ্গে বাংলার মুসলমানের যোগাযোগ বহুদিনের। বাংলা ভাষায় সৈয়দ সুলতান রচিত ১৫ শতকের কাব্যগ্রন্থ নবীবংশ এক অনবদ্য রচনা। তাতে কবি বলেন—

‘কতদেশে কতভাষে কোরানের কথা
দ্বীন মোহাম্মদী বুঝি দেয়স্থ ব্যবস্থা ।
কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন্ন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।

আপন দ্বীনের বোল এক না বুঝিল
পশুর চরিত্র হই সে সব রহিল।
সদায় পড়য় রামকৃষ্ণের কথা
শুনিয়া আমার মনে লাগে অতি ব্যথা।

ফারসী ভাষায় কুরআনের বাখান শুনিল
যত খোরাশানী সবে ঈমান আনিল।
হাওয়া (জাভা) সব জাওয়া ভাবে আরবী বচন
কিতাবের কথা যত কৈল উদ্ধারণ।

রুমী সবে রুম ভাষে কোরানের কথা
লোক সবে লিখি লই করেন্ত ব্যবস্থা ।
তুর্কীস্থানে তুর্কীভাষে লোক আপনার
কোরানের কথা সব লিক্ষি লইল্যা সার ।

সামী সবে সামী ভাষে কোরানের মর্ম
শুনিয়া করিতে আছে মুসলমানী কর্ম ।
পাঠান সকলে পাস্তে ভাষে আপনার
কোরানের কথা শুনি বুঝিল আচার ।

এত ভাবি নবীবংশ পাচালি রচিলু
বোঝে হেন মত করি যা কিছু কহিলু ।

বাংলা ভাষায় শুধু ধর্মীয় কাব্য নয় প্রথম আখ্যান ধর্মী প্রেমের কাব্য রচনা করেন আলাওল। সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ আলাওল আরাকান রাজ দরবারে বসে মগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন ‘পদ্মাবতী কাব্য।’ মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যর উপরে ভিত্তি করে। বাংলায় মুসলমানের জীবনে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বোঝা যায় আধুল হাকিমের কবিতা থেকে। তিনি লেখেন—

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হবিলাষ॥
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন॥

আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত।
যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত॥

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী॥

মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥

বাংলাভাষার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের যোগাযোগ বহু দিনের। ঊনবিংশ শতাধীর শেষে বাংলায় লেখা শুরু করলেন বাঙালি মুসলমান লেখকরা। আমাদের পরিচিত অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের দাদা শেখ আধুর রহিম বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করতেন। তার লেখালেখির বিষয় ছিল মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল মিহির ও সুধাকর। তার আগেই অবশ্য কুষ্টিয়া জেলার মীর মোশারেফ হোসেন লিখেছেন ‘ রত্নাবতী ‘ উপন্যাস, ‘জমিদার দর্পণ’ নাটক এবং চার পর্বে ‘বিষাদ সিন্ধু।’ আমার ছোটবেলায় আমার মা সুর করে বিষাদ সিন্ধু পড়ে শোনাতেন। বইটার একটি আধাতিক গুরুত্ব ছিল। মীর মোশারেফ হোসেন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী বিধৃত করে লেখেন উপন্যাস ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা।’ বিংশ শতাব্দীতে কি কবিতা, কি গানে, কি কি সংবাদ পত্র প্রকাশনায় বাংলায় মুসলমান

সমাজ বিরাট ভূমিকা রাখেন। যদিও বাঙালি হিন্দুরা আমি বাঙালি ও মুসলমান বলতে অভ্যস্ত তবুও বাঙালি মুসলমান সাহিত্য চর্চা, নজরুল ইসলামের মত ক্ষণজন্মা কবি ও সংগীত প্রতিভা, আব্বাস উদ্দিনের মতো সংগীত শিল্পী , কাসেম মল্লিকের (শিল্পী মুন্সি মুহাম্মদ কাসেম) মতো গায়ক যিনি আমাদের বর্ধমান জেলার কালনার মানুষ বাংলা সংস্কৃতি কে লালন করেন। ফলে ১৯৪৭ সালে গোড়া থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্যে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে জ্ঞানতাপস ডঃ শহীদুল্লাহ, দৈনিক আজাদ পাকিস্তানে দুটি রাষ্ট্রভাষার জন্যে লেখেন। ১৯১৮ সালে থেকে ড শহীদুল্লাহ বাংলা কে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে বলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে একটি সভায়।

১৯৪৯ সালে পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বাংলা কে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে রাজরোষে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের সংবিধান সভায় দাবি তোলেন বাংলা কে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্যে। ১৯৫২ সালে ২৭শে জানুয়ারী নাজিমুদ্দিন সাহেব যখন ঢাকায় একটি জনসভায় ঘোষণা করেন উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন ছাত্ররা প্রতিবাদ শুরু করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ শে জানুয়ারী , ১৯৫২ তে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় বাংলা ভাষা সংগ্রাম সমিতি'। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গের আইন সভার অধিবেশন চলা কালে তাঁরা সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালনের কথা ঘোষণা করেন। সেই সময় পুলিশ ছাত্র সংঘর্ষে তখন ঢাকার জেলা শাসক কুরেশি ছাত্রদের উপর গুলি চালনার নির্দেশ দেন বেলা ৩ টের সময়ে। প্রথমে পুলিশের গুলিতে নিহত হন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র বরকত, তারপরে মারা যান ছাত্র রফিকউদ্দিন এবং সালাম বলে ঢাকার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের এক কর্মী। তার থেকেই শুরু হয় শহীদ দিবস এবং ছাত্রী-ছাত্রদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে শহীদ মিনার।

ভারতেও বাংলা ভাষার জন্যে শহীদ হন ১১ জন বাঙালি ১৯ মে ১৯৬১ সালে আসামের শিলচর স্টেশনে। তাঁরা বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্যে আন্দোলন করছিলেন। আসামে বর্তমানে বরাক উপত্যকার তিনটে জেলা , কাছাড় , করিমগঞ্জ এবং হাইলা কান্দি তে বাংলা ভাষা সরকারি ভাষা।

আমাদের পার্শবর্তী রাজ্য বিহারের মানভূমে লোক সেবক সংঘের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয় বাংলাভাষার স্বপক্ষে। অতুল চন্দ্র ঘোষ , বিভূতি দাশগুপ্ত , হেমচন্দ্র মাহাতো এবং ভাবিনি মাহাতোর নেতৃত্বে শুরু হয় টুসু সত্যাগ্রহ ৯ জানুয়ারী ১৯৫৪ সালে। প্রসঙ্গত বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ টুসু গানের উপর একজন অসাধারণ পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এই সময়ই ভজহরি মাহাতোর গান জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি,
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে।
মারবি তোরা কে তারে।।
এই ভাষাতে কাজ চলছে
সাত পুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে।।

অবশেষে ১৭ অগাস্ট ১৯৫৬ , লোক সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে, ২৮ অগাস্ট ১৯৫৬ মানভূমের ১৯টা থানা বাংলায় যোগ করা হয় পুরুলিয়া জেলা হিসাবে। ২১ শে ফেব্রুয়ারী আজ যেখানে মাতৃভাষা অবহেলিত হয়েছে সেখানেই প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। আজকের বাংলাদেশে চাকমা ভাষা, ত্রিপুরাতে ককবরক ভাষা বা পশ্চিম বাংলায় সাঁওতালি ভাষার স্বপক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। ২১ শে ফেব্রুয়ারী এক প্রতিবাদ দীপ্ত দিবস। সেই ২১ শে ফেব্রুয়ারী নিয়ে আল মাহমুদের এক বিখ্যাত কবিতা দিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করি

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!

প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?

পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।

প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে ।

(লেখক , কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।)

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মজিবুর রহমান

মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাষা মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে একটি মাতৃভাষা লাভ করে। দেশ ত্যাগ করা যায়, ধর্মান্তরিত হওয়া যায় কিন্তু মাতৃভাষা পরিবর্তন করা যায় না। মাতৃভাষার এমনই মহিমা। একজন শিক্ষার্থী বিদ্যার্জনের অঙ্গ হিসেবে মাতৃভাষা ছাড়াও এক বা একাধিক ভাষা শেখে।

কিন্তু মাতৃভাষার সঙ্গে সে সবসময়ই একটি বাড়তি নৈকট্য অনুভব করে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যেমন 'নাড়ির টান' মাতৃভাষার সঙ্গে মানুষের তেমনি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ'। ভাষাবিদদের মতে দশ হাজার বছর আগে বিশ্বে জনসংখ্যা ছিল দশ লাখ আর ভাষা ছিল দশ হাজার। মানুষের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আটশো কোটি হয়েছে কিন্তু ভাষার সংখ্যা কমতে কমতে হয়েছে ছয় হাজার। ভবিষ্যতে মানুষের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ভাষার সংখ্যা আরও হ্রাস পাবে। যেসব ভাষার লিপি নেই সেগুলো ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে। ভাষাভাষী জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের প্রধান দশটি ভাষা হল চিনা, ইংরেজি, স্প্যানিশ, আরবি, রুশ, ফরাসি, হিন্দি, বাংলা পর্তুগিজ ও জাপানি। বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ এই দশটি ভাষাতেই কথা বলে। ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় হাজার খানেকের বেশি ভাষা ছিল। এখন সংখ্যাটা তিনশোর মতো। অন্তত দশ হাজার মানুষ কথা বলে এমন ভাষার সংখ্যা দেড়শোর কম। ভারতের সংবিধানে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত ভাষার সংখ্যা বাইশ- (১) অসমীয়া (২) বাংলা (৩) গুজরাটি (৪) হিন্দি (৫) কন্নড় (৬) কাশ্মীরি (৭) মালয়ালম (৮) মারাঠি (৯) ওড়িয়া (১০) পাঞ্জাবি (১১) সংস্কৃত (১২) তামিল (১৩) তেলুগু (১৪) উর্দু (১৫) কোঙ্কনি (১৬) মণিপুরী (১৭) নেপালি (১৮) সিন্ধি (১৯) বোড়ো (২০) ডোগরি (২১) মৈথিলি ও (২২) সাঁওতালি।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জনগোষ্ঠীর পরিচয় প্রধানত দেশ, ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের, এক ধর্মের মানুষের সঙ্গে অন্য ধর্মের মানুষের সাংঘাতিক সংঘাতের ঘটনার অভাব নেই। সেই তুলনায় দুটো পৃথক ভাষার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম। উপমহাদেশে অবশ্য ভাষাকে কেন্দ্র করেই এমন ইতিহাস রচিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত গোটা বিশ্বেই বিরল। এই নজিরবিহীন ও গর্বের ঘটনার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা ভীষণভাবে জড়িত। বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির প্রাণ উৎসর্গকে স্বীকৃতি দিতে বিশ্বের বৃহত্তম শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়। বেলুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়া, সিন্ধু, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও বাংলার পূর্বাংশ নিয়ে গঠিত হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র পাকিস্তান। প্রথম চারটি প্রদেশ একত্রে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পঞ্চম প্রদেশটি পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত হয়। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল বারোশো মাইল। ধর্ম এক হওয়া ছাড়া ভূপ্রকৃতি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দুই পাকিস্তানের মধ্যে বিশেষ মিল ছিল না। বরং ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনৈক্য ছিল অনেক। এজন্য নবগঠিত পাকিস্তানের দুই বাহুর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার বদলে বিবাদ লাগতে বিলম্ব হয়নি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক এই বিবাদের ভিত্তি রচনা করে। সেই সময় পাকিস্তানের প্রধান ভাষা ছিল ছয়টি- বাংলা, বেলুচি, পশতু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও উর্দু। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে মোটামুটি সাড়ে চার কোটি ও আড়াই কোটি। পূর্ব পাকিস্তানের নব্বই শতাংশ এবং সমগ্র পাকিস্তানের ৫৫ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দু ছিল পাঁচ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা এবং এটি কোনো প্রদেশেরই প্রধান ভাষা ছিল না। বাকি চল্লিশ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বেলুচি, পশতু, সিন্ধি ও পাঞ্জাবি। নাম দেখেই বোঝা যায় এই ভাষাগুলো ছিল যথাক্রমে বেলুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়া, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের প্রধান ভাষা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি। কিন্তু উপমহাদেশে আরবির প্রসার ঘটেনি। বরং উর্দুর চর্চা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। অভিজাত মুসলমানরা ইংরেজির সঙ্গে উর্দুটাও শিখতেন। এজন্য পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী তথা মুসলিম লীগের জাতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দের উর্দুর প্রতি একটা অনুরাগ ছিল। তাঁরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এক ও একমাত্র উর্দুর কথাই বিবেচনা করেন। এরই অঙ্গ হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডাক বিভাগের কাগজপত্রে ইংরেজির সঙ্গে উর্দু জুড়ে দেওয়া হয়। মুদ্রাতেও ইংরেজির সাথে উর্দু লেখার ব্যবস্থা করা হয়। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইভাবে জাতীয় স্তরে পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হতে থাকে। বাংলা ভাষার এই উপেক্ষা ও অসম্মান নিশ্চিতভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ব্যথিত করে এবং তাদের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি হয়। তারা উপলব্ধি করে যে, বাংলা ভাষা অবদমিত হলে বাঙালির জাতিসত্তাও নতুন রাষ্ট্রে অদূর ভবিষ্যতে সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা কম। বাংলা ভাষা গুরুত্ব হারালে বাঙালির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সুতরাং, বাংলা ভাষার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা মেনে নেয়া যায় না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। বক্তৃতার ভাষা নির্ধারণ করা হয় ইংরেজি ও উর্দু। কুমিল্লা থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত

গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় বক্তব্য পেশ করতে চাইলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তিনি একাধিক অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে না। মিঃ দত্ত তাঁর সাধ্যমত প্রতিবাদ জানান। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২৬শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করেন। রাজনৈতিক নেতারা ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন জানান। গড়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। মিঃ জিন্নাহ মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সমবেত বাংলাভাষী জনতা জিন্নাহ সাহেবের ছবি ছিঁড়ে ও তাঁর সম্মানে তৈরি তোরণ পুড়িয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ তাঁর ভাষা-ভাবনায় অনড় থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি বলেন, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পাবে। ছাত্ররা 'না, না' ধ্বনি তুলে প্রতিবাদে সরব হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মিঃ জিন্নাহ দেহত্যাগ করেন।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেয়। মার্চ মাসে গঠিত 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে উর্দু ও আরবি মিশ্রিত খিচুড়ি বাংলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক মদনমোহন তর্কালঙ্কার- 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' সংস্কারকৃত- 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি/সারাদিন আমি যেন নেক হয়ে চলি।' কাজী নজরুল ইসলাম- 'সজীব করিব মহাশ্মশান।' সংস্কারকৃত- 'সজীব করিব গোরস্থান।" প্রচলিত বাগধারা- 'দাতা কর্ণ', 'বাঘের মাসি', 'বিদ্যার দিগগজ', 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' সংস্কারকৃত হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে 'দাতা হাতেম', 'বাঘের খালা', 'এলেমের জাহাজ', 'অধিক পীরে মোজেজা নষ্ট'। বাংলা ভাষার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ১১ই মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' উদযাপন করা হয়। ২৩শে জুন মুসলিম লীগ ভেঙে গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ। উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা তথা অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে দলটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি অপসারণ করা হয়।

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। জনসভা থেকে যথারীতি প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ৩০শে জানুয়ারি মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই দিন পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। ধর্মঘট ও মিটিং-মিছিল বানচাল করার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান নিয়ে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের বাধা দেয় এবং কাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছোঁড়ে। ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে প্রতিবাদ মিছিলেও পুলিশ গুলি চালায়। অনেকেই শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। তবে পুলিশ একাধিক মৃতদেহ লোপাট করে দেয়। এজন্য ভাষা শহিদদের সকলের পরিচয় সুনির্দিষ্ট করে পাওয়া সম্ভব হয়নি। যে পাঁচজন ভাষা শহিদ হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরা হলেন— (১) স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র আবুল বরকত (জন্ম- ১৬.৬.১৯২৭), (২) কলেজছাত্র রফিক উদ্দিন আহমেদ (জন্ম- ৩০.১০.১৯২৬), (৩) হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান (জন্ম- ২৪.১.১৯১৮), (৪) ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের কর্মচারী আব্দুস সালাম (জন্ম- ২৭.১১.১৯২৫) ও (৫) কৃষিজীবী আধুল জাব্বার (জন্ম- ১৩.৮.১৯১৯)। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। দু'দিনের মধ্যেই পুলিশ ও সরকারি লোকজন সেটি ভেঙে ফেলে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শাসকদল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধীরা একজোট হয়ে লড়াই করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও সাধারণ ছুটি ঘোষণা, স্থায়ী শহিদ মিনার স্থাপন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি জনপ্রিয় দাবি ইস্তেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ২১শে ফেব্রুয়ারির ২১-এর সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য ২১ দফা কর্মসূচি স্থির করা হয়। নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ন'টিতে জয়লাভ করে। ২১৫টি আসন নিয়ে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হন। কিন্তু ৩০শে মে এই সরকারকে বরখাস্ত করে গভর্ণরের শাসন প্রবর্তন করা হয়।

১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আয়োজিত কর্মসূচি আবারও রক্তাক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫৭-এর নভেম্বর থেকে '৫৮-এর মার্চ পর্যন্ত ২১-এর ভাষা শহীদদের স্মৃতিতে মিনার তৈরির কাজ কিছুটা হওয়ার পর দীর্ঘদিন অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। ১৯৬২ সালে আবার নির্মাণকার্য শুরু হয়ে ১৯৬৩ সালের ২০শে

ফেব্রুয়ারি সমাপ্ত হয়। শহীদ মিনারের মাঝের দীর্ঘতম স্তম্ভটি মায়ের এবং দু'পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট স্তম্ভগুলো সন্তানের প্রতীক।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে তাসখন্দে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে বিরোধী দলগুলো লাহোরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছ'দফা দাবি পেশ করেন। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হল, যে শহরে একদিন ভারত ভেঙে পাকিস্তান গঠনের বীজ বোনা হয়েছিল সেই শহরেই আজ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গঠনের চারাগাছ রোপণ করা হল। ১৯৬৮ সালের প্রথম ভাগে শেখ মুজিব সহ ৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়। আন্দোলনের চাপে পড়ে পাকিস্তানের প্রশাসন ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জেলমুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল সংবর্ধনা সভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করে।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান বন্যা সহ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। প্রচুর মানুষ মারা যায় এবং কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্গতদের পাশে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ কিংবা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের দাঁড়াতে দেখা যায়নি। এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী তথা বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে আরও বিরূপ হয়ে পড়ে। ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তান পরিচিত হবে বাংলাদেশ নামে। এই ঘোষণা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের পক্ষে একটি বড় পদক্ষেপ ছিল।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পায় ১৬৭টি আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টির মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পায় ৮৮টি। অর্থাৎ, ৩১৩ আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি নিয়ে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সেই হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তা হতে দেননি। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের নেতার নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেওয়া জনগণের রায়কে উপেক্ষা করতে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের চূড়ান্ত সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের সুবিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'তিনি সরকারের সঙ্গে সমস্ত রকম অসহযোগিতার ডাক দেন। ২৫শে মার্চ থেকে পাক সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে দমন করতে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তাঁকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাক সামরিক বাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী রাজাকার, আল বদর ও আল হামাস বাহিনী বাংলাদেশে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। ব্যাপকভাবে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট চালানো হয়। শহীদ মিনারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ১১ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে 'স্বাধীন' বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ও জাতীয় পরিষদের সদস্য আতাউল গনি ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে গঠিত হয় মুক্তিফৌজ। রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকরা মুক্তিফৌজে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সংহতি জানাতে বিদেশের মাটিতে 'বাংলাদেশ মিশন' খোলা হয়।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে পাক বাহিনী ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে আঘাত হানে। ভারতও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বিলম্ব করেনি। পাকিস্তানের পক্ষে আর লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। কাজেই কালবিলম্ব না করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয়। বাংলায় সংবিধান রচনা করা হয়। শহীদ মিনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় বক্তৃতা করেন।

১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে কানাডা প্রবাসী দুই বাংলাদেশী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম 'বিশ্ব মাতৃভাষা' সংগঠনের পক্ষ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের কাছে আবেদন জানান। এরপর আবেদনটি ইউনেস্কোতে পাঠানো হয়।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও একই প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'মাতৃভাষাগুলোর উন্নতি ও বিকাশের অন্যতম কার্যকর পন্থা হল 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' প্রতিষ্ঠা।... ১৯৫২- এর ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার স্বার্থে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতি এই মাতৃভাষা দিবস।' ভারত সহ ২৭টি দেশ এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

নভেম্বরে ইউনেস্কো প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের ১৮৮টি দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন শুরু হয়। এখন বাংলাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের দাপ্তরিক ভাষা করার প্রচেষ্টা চলছে। ❐

(লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।)

বঙ্গ বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন ও বঙ্গ বাজেট সবই মায়ার খেলা

অমিত দাশগুপ্ত

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতেই অষ্টম বঙ্গ বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন (বিজিবিএস) হয়ে গেল। তার পরপরই বাজেট পেশ করা হল বিধানসভায়। প্রতিবারের মত এবারেও বিজিবিএস-এ দামি শিল্পপতিরা উপস্থিত ছিলেন। বিপুল অঙ্কের টাকা লগ্নি করে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের শিল্প মানচিত্রে উজ্জ্বল করে তোলার প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিলেন। সম্মেলনের শেষে জানা গেল মোট ৪, ৪০, ৫৯৫ কোটি টাকার শিল্প বিনিয়োগের জন্য ২১২টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত বছরে বিজিবিএস হয়নি। তার আগের বছরে সপ্তম বিজিবিএস-এ ১৮৮ টি মৌ এর মাধ্যমে ৩.৭৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল। ২০২২ সালের ষষ্ঠ বিজিবিএস-এ ১৩৭ টি মৌ ও ৩.৪২ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবের চুক্তি হয়েছিল। তার আগের ৫ টি বিজিবিএস-এ ১২ লক্ষাধিক টাকার বিনিয়োগের জন্য মৌ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবারকার বিজিবিএস-এ ৪.৪১ লক্ষ কোটি টাকার মৌএর পাশাপাশি ৯১ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ চূড়ান্ত হয়েছে। রিলায়েন্স গোষ্ঠি আগামী ১০ বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা, অম্বুজা নেওটিয়া আগামী ৫ বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা, সজ্জল জিন্দাল গোষ্ঠি শালবনিতে ৮০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১৬ হাজার কোটি টাকা এবং আরপিজিএস (সঞ্জীব গোয়েঙ্কা) গোষ্ঠি আগামীতে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে। বাকি ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা সাধারণ মৌ।

যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, যত মৌ স্বাক্ষরিত হয় তার কতটা বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তদর্থে বিজিবিএস-এ স্বাক্ষরিত মৌএর কোনো তালিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা শিল্পোন্নয়ন নিগম প্রকাশ করেছে বলে জানা নেই। অন্তত শিল্পোন্নয়ন নিগমের ওয়েবসাইটে তা নেই। ফলে বিগত বছরগুলির ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের মৌএর পরিণতি কী তা জানা নেই। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় কোথায় তা হয়েছে তা তিনি বলেননি। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের তরফেও তা জানানো হযনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় নিন্দুকেরা মিছিমিছি বিজিবিএস-এর মত অনুষ্ঠানের সমালোচনা করছেন। এসব না বলে তিনি যদি তাঁর অধীনস্থ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে গত ১৪ বছরের কালানুক্রমিক শিল্প বিনিয়োগের তালিকা প্রকাশ করতে বলে নিন্দুকদের নাক-কান কাটার বন্দোবস্ত করতেন তাহলে সব ধাঁধার মীমাংসা হত।

জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর প্রকাশিত শিল্প সংস্থার বার্ষিক সমীক্ষা (এ্যানুয়াল সার্ভে অফ ইন্ড্রাস্টিজ বা এএসআই) অনুসারে কারখানা ক্ষেত্রে (ফ্যাক্টরি সেক্টর) পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োজিত মূলধন (ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল)-এর পরিমাণ ২০২২-২৩ সালে ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ সালে ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা। ফলে ওই ৮ বছরে ওই ক্ষেত্রে নিট বিনিয়োগের পরিমাণ ৯১ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা। ওই সময় কালে এএসআই তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ফ্যাক্টরি ক্ষেত্রে সামগ্রিক পুঞ্জীভূত অবচয় (কিউমুলেটিভ ডেপ্রিসিয়েসন) হয়েছে ৭৪ হাজার ২৯৯ কোটি টাকা। ফলে সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিমাণ (নিট বিনিয়োগ, সামগ্রিক পুঞ্জীভূত অবচয়) ওই হিসেবে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৩৬ কোটি টাকা, যা মুখ্যমন্ত্রীর বলা ১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের ১৪ শতাংশেরও কম। মনে রাখা দরকার, এএসআই তথ্যে মৌএর অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগের বাইরেও বিনিয়োগ ধরা হয়ে থাকে। ফলে বিজিবিএস-এ ঘোষিত মৌএর থেকে পাওয়া শিল্প বিনিয়োগ ওই পরিমাণের থেকেও অনেক কম। এটা অনস্বীকার্য যে, বিনিয়োগের জন্য মৌ এবং প্রকৃত বিনিয়োগের মধ্যে সময়ের তফাত থাকে। কিন্তু তাই বলে এতটা ফারাক অবশ্যই মৌএর ঘোষণাকে রসিকতায় পর্যবসিত করে।

ভারত সরকারের শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রণোদনা বিভাগ (ডিপার্টমেনট ফর প্রোমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইন্টার্নাল ট্রেড) কর্তৃক প্রদত্ত ইনডাস্ট্রিয়াল এন্টরিপ্রিনিউর মেমোরান্ডাম (আইইএম) পার্ট এ-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ২০১৬ সাল থেকে জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের জন্য ৩৭২টি আইইএম পেশ করা হয়েছে যার সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৬, ৮৫২ কোটি টাকা। সারা ভারতের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ১৪, ৭৫৯ এবং ৪৪, ৪৯, ৫৭৪ কোটি টাকা। অতএব, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের ভিত্তি পত্তন হয়েছে সংখ্যার বিচারে সারা ভারতের ২.৫২ শতাংশ, বিনিয়োগের পরিমাণের নিরিখে ১.৫ শতাংশ। ইনডাস্ট্রিয়াল এন্টরিপ্রিনিউর মেমোরান্ডাম (আইইএম) পার্ট বি ,র তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে ওই সময়কালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে ২৩৩টি (সারা ভারতে ৭,৬২৬) শিল্প সংস্থা, মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪০, ৭৩১ (সারা ভারতে ১৯, ৫৭, ২৪৫) কোটি টাকা। ফলে ওই সময়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর নিরিখে দেশের ৩.০৫ শতাংশ এরাজ্যে কাজ শুরু করেছে এবং বিনিয়োগের ২.০৮ শতাংশ এরাজ্যে এসেছে। যেহেতু, কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যতিরেকেই মুখ্যমন্ত্রী বিনিয়োগের পরিমাণ বলছেন, এবং তা কী এএসআই পরিসংখ্যান, কী আইইএম তথ্য কোনো কিছুর ধারে কাছেও যাচ্ছে না, তাই ওই ১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগকে রাজনৈতিক প্রচার বলেই মনে হচ্ছে।

রাজ্য বাজেট, ২০২৫ -- ২৬

৫ ফেব্রুয়ারি বিজিবিএস শুরুর ঠিক এক সপ্তাহ পরে রাজ্যের আরেকটি মেগা ইভেন্ট রাজ্য বাজেট, ২০২৫-২৬ উপস্থাপিত হল। বাজেট হিসেব নিকেশের ব্যাপার, তাতে রসকস থাকার কথা নয়। কিন্তু ইদানিং কালের কেন্দ্র বা রাজ্য সব বাজেটেই কাব্যি করা হয়। তাছাড়া, উভয় বাজেটেই শাসক দলের প্রধানের গুণকীর্তন বাধ্যতামূলক। বাজেট বক্তৃতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচার প্রোপাগান্ডার অস্ত্র হয়ে উঠেছে। রাজ্য বাজেটে বলা হয়েছে এই সরকার ২ কোটি জীবিকার সংস্থান করেছে। এর আগে যে বিজিবিএস-এর কথা বলা হল, সেখানে ষষ্ঠ বিজিবিএস-এ ৩.৪২ লক্ষ টাকার মৌএর মাধ্যমে ৪০ লক্ষ কর্ম সংস্থানের কথা বলা হয়েছিল। দেখা গিয়েছে যে, মৌএর বাস্তবায়ন মরীচিকা, ফলে ওই কর্মসংস্থানেরও অবস্থা অনুমেয়। রাজ্য সরকার (কেন্দ্র সরকারও) কখনোই কর্ম সংস্থানের বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে না। ফলে অনায়াসেই যেকোনো পরিসংখ্যান দেওয়া যায়।

বাজেট বক্তৃতায় রয়েছে ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০২৩-২৪ সালে মূলধনী ব্যয় ১৩ গুণ বেড়ে ২৮, ৯৬৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এটা বলা হয়নি যে ২০২৩-২৪ এর বাজেটে মূলধনী ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩৪,০২৬ কোটি টাকা; যেখানে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৬ শতাংশ কম। ২২-২৩ সালেও মূলধনী ব্যয় ছিল ২২,১৮৯ কোটি টাকা, বাজেট বরাদ্দ ৩৩,১৪৪ কোটি টাকার তুলনায় ৩৩ শতাংশ কম।

২০২৪-২৫ এর সংশোধিত মূলধনী ব্যয়ের অনুমান ২৯,১৪৭ কোটি টাকা যা ওই বছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১৯ শতাংশ কম। পূর্বতন বাজেটগুলির গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয় চলতি বছরে, ২০২৪-২৫ সালে মূলধনী ব্যয় সংশোধিত অনুমানের থেকে কম হবে, কারণ, বিগত বছরগুলিতে তেমনটাই ঘটেছে। বাজেট বক্তৃতার ভাষ্য অনুযায়ীই ওই মূলধনী ব্যয়ের ফলেই অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকাঠামো তৈরি হয। তাহলে বাজেট বরাদ্দের তুলনায় বিপুল কম ব্যয় করা নিশ্চয়ই পরিকাঠামো তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে গন্ডায় গন্ডায় বঙ্গ বিশ্ব বানিজ্য সম্মেলন করেও শিল্প তৈরি হচ্ছে না, কর্মসংস্থানের ভাঁড়ারও ফাঁকাই থাকছে।

রাজ্য বাজেটের একটি খারাপ দিক হচ্ছে, বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে প্রকৃত ব্যয়ের বিপুল পার্থক্য। যেমন ২০২২-২৩ সালে মোট বাজেট ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২, ৯১,০৩০ কোটি টাকা; প্রকৃত ব্যয় হযেছিল প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা কম। ২০২৩-২৪ সালে মোট বাজেট ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩,০৯,১৬২ কোটি টাকা, কম হয়েছিল ২৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি। সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রের মূলধনী ব্যয় যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদির পরিকাঠামো তৈরি করে, সেসব ক্ষেত্রেও বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ হয় প্রকৃত ব্যয় হয় তার অনেক কম। ২০২২-২৩এ ওই বরাদ্দ ছিল ১৩,৩২৬ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছিল ৯,৯৫২ কোটি টাকা; অর্থাৎ ৩,৩৭৪ কোটি টাকা বা ২৫ শতাংশ কম। ২০২৩-২৪এ প্রকৃত ব্যয় ছিল বাজেট বরাদ্দের থেকে ২৪ শতাংশ কম। ফলে বাজেটে যে মূলধনী ব্যয়ের কথা ঘোষণা করা হয় তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেহেতু সাধারণ মানুষের দৃষ্টির বাইরেই রাজ্য বাজেট থেকে যায়, যা বাজেটে তেমন ভাবে বলার কথা নয়, যেমন মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা, সেগুলিই হেডলাইন হয়, তাই গুরুত্বপূর্ণ 'ছোটখাটো' বিষয়গুলি নজর টানে না।

এদেশে এখন কুম্ভমেলাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, সে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা সমাজবাদী পার্টির সাংসদ নেতা অথবা তৃণমূল সাংসদের ডুব দেওয়ার জন্য, কিংবা অমৃত লাভের দিশায় ছুটন্ত গরিব মানুষদের পদপিষ্ট হওয়ার জন্য, তাই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা পরিবেশের কথা ভাবার কীই বা দরকার। এই চিন্তা বছরের পর বছর এই রাজ্যের বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২এর বাজেটের পরিসংখ্যানগুলি এই আলোচনায় আনিনি কারণ, সেই সময়টা ছিল অতিমারির সময়। কিন্তু সেই সময় থেকেই তো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা পরিবেশের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ২০২০-২১ সালে ওই খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল সামান্য ১৩৬ কোটি টাকা; প্রকৃত খরচ হয়েছিল ১৯ কোটি টাকা, ২০২১-২২ সালে ১৪২ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৪৫ কোটি খরচ হয়েছে; ২০২২-২৩ এ সেই পরিমাণগুলি ছিল যথাক্রমে ১৪৭ কোটি ও ৩১ কোটি টাকা; ২০২৩-২৪ সালে ১৪০ কোটি ও ৫১ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫এর প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ অজানা। তবে তাও যথেষ্ট কমই হবে। বাজেট বরাদ্দের কোনো মানেই অন্তত এই খাতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সামগ্রিক বাজেটের ১,০০০ টাকার মধ্যে ৫০ পয়সার কম বরাদ্দ করা হয় বাজেটে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশের জন্য, প্রকৃত ব্যয় করা হয় সামগ্রিক ব্যয়ের ১,০০০ টাকার মধ্যে ২০-২২ পয়সা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশকে কত তুচ্ছ মনে করে এই রাজ্য সরকার তা বোঝাই যায়।

বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের বরাদ্দ নাকি বিপুল। ২০২৪-২৫ সালের বাজেটে শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৭, ৪৭০ কোটি টাকা। এবারে তা বেড়ে হয়েছে ৫০,৫৫৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬,৫ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মাথায় রাখলে কেউ এই বৃদ্ধি নিয়ে বড়াই করতে পারে না, তৃণমূলের 'সেনাপতি' সাংসদ পারেন। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট গত বাজেট বরাদ্দের থেকে বেড়েছে ৯ শতাংশ। কিন্তু চলতি বছরের সংশোধিত অনুমান ছিল ২২, ৪৯৩ কোটি টাকা, এবারের বাজেটে সেটা কমে হয়েছে ২১, ৯৩৯ কোটি টাকা। ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রগুলি যথাবিহিত অবহেলিতই থেকে গিয়েছে। বাজেট বক্তৃতাতেই বলা হয়েছে এরাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপন্ন (জিএসডিপি) ১৮ লক্ষ কোটি টাকা। তাহলে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ জিএসডিপির মাত্র ২.৮ শতাংশ। আর স্বাস্থ্যখাতে তা ১.২ শতাংশ।

লক্ষ্মীর ভান্ডারে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আবাস যোজনাতে বরাদ্দ হয়েছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী,

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ যথেষ্টই কমেছে। রাজ্য সরকারের অন্যতম গর্বের প্রকল্প কন্যাশ্রীর বাজেট কেন ১৩৭৪ কোটি টাকা থেকে ৪২ শতাংশ কমে গেল তা বোঝা দুস্কর যখন অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলছেন যে, এই বাজেটের অর্ধেকটাই মহিলাদের।

কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এগুলিতেও ব্যয় বরাদ্দ তেমন বাড়েনি, গ্রামোন্নয়নে তা গত বাজেট বরাদ্দের থেকে এক-চতুর্থাংশ কমে ১৮, ৮৯২ কোটি টাকা থেকে ১৪, ২২৭ কোটি টাকা হয়েছে; কৃষিতে বরাদ্দ সামান্য (৩ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৬২০ কোটি টাকা থেকে ২৩,২৮৩ কোটি টাকা হয়েছে। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ, ২.৬ শতাংশ; ৫,৬৫৭ কোটি থেকে ৫৮০৫ কোটি টাকা।

বিজিবিএস-এ শিল্পবন্ধু সরকার শিল্প ও খনিজ সংক্রান্ত খাতে ২০২৪-২৫-এর বাজেট বরাদ্দ ২,৭৪৮ কোটি টাকা থেকে এই বাজেটে বরাদ্দ কমিয়েছে; ৫৪ কোটি টাকা কমিয়ে বরাদ্দ করেছে ২, ৬৯৪ কোটি টাকা। অবশ্য ২৩-২৪ সালের যে প্রকৃত ব্যয় তা ছিল ৮৪৪ কোটি টাকা, ওই বছরের বাজেট বরাদ্দ ২, ৫৩৪ কোটি টাকার তিনভাগের একভাগ। এভাবেই সরকার সাজানো গোছানো বঙ্গ বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন করে শিল্প স্থাপনের ঘোষণা করছে, অপরদিকে শিল্প দফতরের বাজেট কমাচ্ছে, যা বাজেট করছে তার এক ভগ্নাংশ পরিমাণ ব্যয় করছে।

বঙ্গ বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন অথবা বাজেট, দুটিই কেবল সরকারি ঘোষণা মাত্র। উপরের আলোচনা এবং রাজ্য বাজেটের বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিস্কার যে, ২০২৫-২৬ এর বাজেট নিয়ে আলোচনা আদতে মরীচিকার পিছনে ছোটা। বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দের এক বৃহদাংশ প্রকৃত ব্যয়ে রূপান্তরিত হবে না। যেমন, বঙ্গ বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের অধিকাংশ মৌ বা লেটার অফ ইন্টেন্ট-ই বাস্তবায়িত হবে না। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, আর্থিক পরিস্থিতি, শিল্পোন্নয়ন, শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান এইসব কিছুর আলোচনা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নিরিখে করা অসম্ভব; তা করা যায় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে।অর্থনীতির পরিভাষায় বাজেট বা বিজিবিএস নিয়ে এক্স-আন্তে (ঘটনা-পূর্ব) আলোচনা করা অর্থহীন, এক্স-পোস্ট (ঘটনা-পরবর্তী) বিশ্লেষণই কেবল সম্ভব। ❐

(লেখক অর্থনীতির অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক।)

সংখ্যালঘু উন্নয়নের পথরেখা

অশোক সরকার

ভারতীয় সংবিধানে জাতি ভিত্তিক সংরক্ষণের কথা আছে, কিন্তু ধর্ম ভিত্তিক সংরক্ষণ নিষিদ্ধ। এটা যেমন একটা বাস্তবতা, অন্যদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠী যে নানা সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে পিছিয়ে আছে, সেটাও একটা বাস্তবতা। তাহলে ভারতীয় রাষ্ট্র মুসলিম সমাজকে কিভাবে এগোতে সাহায্য করবে? এখনো পর্যন্ত যা হয়েছে দেখলে দেখব যে একদিকে সংখ্যালঘু কমিশনগুলি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হওয়া সামাজিক বা রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, নয়ত রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্য, আবাসন, স্কলারশিপ, বা ভাতা ইত্যাদি খাতে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে আর একাধিক রাজ্য সরকার তপশিলি জাতি ও ওবি ওইসি সংরক্ষণের মধ্যে মুসলিমদের কিছু অংশের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ওইভাবে সংরক্ষণের কিছু প্রচেষ্টা আদালতে ধাক্কাও খেয়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, ভারত যেহেতু দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ এবং সাধারণভাবে মুসলিমরা স্বাধীনতার এত বছর পরেও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের -- পার্সি, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে, ভারতের রাষ্ট্র তাদের জন্য বিশেষ কি করতে পারে?

সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে এক নতুন ভাবনা কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে যা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সেই প্রেক্ষিতে এই লেখা। রিপোর্টটির নাম Rethinking Affirmative Action for Muslims in Contemporary India। রিপোর্টটিতে খুব সঠিকভাবেই বলা হচ্ছে যে ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ মুসলিমদের এগিয়ে নিয়ে যাবার মুল মন্ত্র হতে পারে না, তিনটে কারণে। প্রথমত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ধর্মীয় সংরক্ষণ করতে গেলে তা নিশ্চিতভাবে আদালতে ধাক্কা খাবে। দুই, আজকের ব্যাপক সাম্প্রদায়িকতার মাহোলে ধর্মীয় সংরক্ষণ রাজনৈতিকভাবেই সমীচীন হবে না, আর তিন ভারতের সংবিধানের মূল আধার যে ধর্মনিরপেক্ষতা, তাকে ঘুরিয়ে পশ্চাৎঘাত করাটাও কোন রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা হতে পারে না। কাজেই সেকুলার কাঠামোর মধ্যেই মুসলিমদের এগিয়ে নেওয়ার সহায়ক ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে।

সাম্প্রতিক রিপোর্টটিতে চারটি রাস্তার কথা বলা হয়েছে। চারটি রাস্তাই সরকারি নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রাখে। ২০১১-র সেন্সাস অনুযায়ী ৩১টা জেলা আছে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৫০ ভাগের বেশি আর ৪১টা জেলা আছে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ২০-৫০ ভাগ। সরকারি aspirational district গুলির যে তালিকা আছে তার মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিলে পুরো জেলা ও এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৭০টি অঞ্চল পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে বিশেষভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ দরকার, যাকে এক কথায় এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী বলা যেতে পারে। সেটা করলে তা সরকারি প্রাথমিকতার সঙ্গে মিলবে, সব রকম সমুদায়েরই উন্নয়ন হবে, মুসলিমদের তো হবেই। এই কাজে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ দুইই লাগবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য সরকারি বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে।এই প্রসঙ্গে টাউন বা শহর অঞ্চলের কথাও ওঠে। আসাম বা বিহারে টাউন বা শহরে মুসলিমদের সংখ্যা কম হলেও মধ্যপ্রদেশে, তামিলনাড়ুতে, মহারাষ্ট্রে মুসলিমদের শহরিকরণ ঘটেছে অনেক বেশি। কাজেই একই ধরণের এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি টাউন বা শহরেও দরকার হবে।

এলাকা উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? সাধারণভাবে এলাকা উন্নয়নের চারটি অঙ্গ; এক আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা; দুই, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদন ও পরিষেবা উদ্যোগগুলির আধুনিকীকরণ করা, এবং সেই ধরণের উদ্যোগের প্রসার ঘটানো, তিন, মানব সম্পদের উন্নয়ন। পাশাপাশি কৃষির আধুনিকিকরণও করতে হয়। এই প্রচেষ্টাগুলির ফলে একই সাথে কর্মসংস্থান বাড়ে, রোজগার বাড়ে, বাজার ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, শিক্ষা ও দক্ষতার প্রসার হয়, তাতে ভবিষ্যতের উন্নয়নের পথ সুগম হয়। সাধারণত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি ১০-১৫ বছরের জন্য লাগু রাখতে হয়, মোটামুটি সফলভাবে রূপায়িত হলে, সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পথ খুলে যায়। সরকার যেহেতু নানা সময়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, কাজেই এই ধরণের এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচিতে কারুর আপত্তি থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয় যে রাস্তার কথা বলে হয়েছে তা হল তাকে এক কথায় সেক্টর আপ্রোচ বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে বেশ কিছু উৎপাদন ক্ষেত্রে মুসলিমদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। কার্পেটশিল্প, বয়নশিল্প, পেতলের কাজ, তালা-চাবি বানানো, সুগন্ধি বানানো, চামড়ার কাজ, বাদ্যযন্ত্র বানানো ইত্যাদি উৎপাদন ক্ষেত্রে যেদিকেই তাকানো যাক মুসলমানদেরই প্রাধান্য। এই সব শিল্পের জন্য নানা যোজনাও আছে, কিন্তু সেইগুলি সব মিলিয়ে কতটা প্রভাবি হতে পেরেছে তা নিয়ে কোন সামগ্রিক চিত্র নেই। এই শিল্পগুলি সবই শ্রমনিবিড় এবং অসংখ্য মানুষের রুটিরুজির জোগান দেয়। এর মধ্যে কার্পেটের মত শিল্প তো বিদেশি মুদ্রাও এনে থাকে। তাই দ্বিতীয় রাস্তা হতে পারে এই শিল্পগুলিকে একটি সর্বাঙ্গীণ সেক্টর উন্নয়ন নীতির মধ্যে আনা যাতে এই শিল্পগুলির আধুনিকীকরণ হতে পারে, আর বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে, রোজগার বাড়তে পারে, শিল্পগুলির প্রসার হতে পারে। তা করতে গেলে একদিকে যেমন টেকনিক্যাল দক্ষতা বাড়াতে হবে, উৎপাদকতা বাড়াতে হবে, তেমনি গুনমান বাড়াতে হবে, সাপ্লাইচেন উন্নত করতে হবে, ব্যাংকিং সহায়তা বাড়াতে হবে, ব্রান্ডিং করতে হবে, উন্নতমানের মেশিনটুলস ওয়ার্কশপ স্থাপন করতে হবে, এবং দ্রব্যসম্ভার diversify করতে হবে। এখন এর অনেক কিছুই করা হয় কিন্তু বেশিরভাগটাই খাপছাড়া ভাবে। প্রথমটি যদি এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি হয়, দ্বিতীয়তই হল সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি। সেক্টর উন্নয়নে একটা বিশেষ বিষয়ে আমাদের দেশে সব সময়ই কম জোর দেওয়া হয়েছে, তা হল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। আলাদা আলাদা বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মাধ্যমে সহায়তা সাধারণত আমলাতান্ত্রিকতা ও নিয়মের বেড়াজালে আটকে যায়, তাই এক ধরনের কর্পোরেট ব্যবস্থার দরকার হবে। এর কথায় পরে ফিরব।

তৃতীয় যে রাস্তার কথা বলা হয়েছে, সেটা সেই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ঘিরেই তবে ধর্মীয় সংরক্ষণের পথে নয়। এখানে যুক্তি পরমম্পরাটি একটু জটিল তাই সাবধানে বলার চেষ্টা করছি। ভারতীয় সংরক্ষণের তিনটি অঙ্গ , তপশীলি জাতি (SC), জনজাতি (STV আর অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি (OBC)। এর মধ্যে তপিশিলি জাতি মূলত অস্পৃশ্য বলে পরিচিত ছিল এমনকি তারা ধর্মীয় দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজের বাইরে ছিল। অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিগুলিও নানা সামাজিক ও আর্থিক ভেদাভেদের শিকার ছিল। এছাড়া তপশিলি জাতি বা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির অনেকগুলিই বিশেষ বিশেষ পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে জাতিগত শোষণের ফলেই এই জাতিগুলির অনেকেই ইসলাম বা দক্ষিণভারতে, মহারাষ্ট্রে খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু তাতে সমাজে ও পেশায় জাতিগত অবস্থান বিশেষ বদলায় নি। সেই কারণেই দলিত খ্রিস্টান বা দলিত মুসলমান কথাটা চালু হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তারা তপশিলি জাতির আওতায় আর আসে না। কিন্তু অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির আওতায় আসে। ওবিসি সংরক্ষণের ভিত্তি হল সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা তার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সবাই আছে। এই যুক্তিকে মাথায় রেখে কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্র তামিলনাড়ু বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ওবিসিদের মধ্যে একাধিক সাবকোটা করেছে এবং তার মধ্যে একটা সাব-কোটা মুসলিম ওবিসিদের জন্য রেখেছে, সৌভাগ্যের কথা নীতিগুলি সবকটাই আদালতে মান্যতা পেয়েছে।

চতুর্থ, জনসমাজ ও সামুদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির এই ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা আছে। জনসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি ধারাবাহিকভাবে নানা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের পথে সাথি হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। সামুদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন চাষিদের, মহিলাদের, যুবাদের, আদিবাসীদের সংস্থা ও সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু দেখা যায় কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে মুসলিম সমাজের সঙ্গে কাজ করছে এমন জনসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যায় কম, এবং সেগুলির অনেকগুলিই ইসলাম ধর্মালম্বী চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান, সেকুলার প্রতিষ্ঠান নয়। জনসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে সব দাতা সংস্থা সহায়তা করে থাকেন এ ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার দরকার আছে। সামুদায়িক ও জনসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ শক্তি এই যে তারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করে, সামুদায়িক শক্তির বিকাশ ঘটায়। আর্থিক, শিক্ষা, জীবিকা, স্বাস্থ্য, বা অন্য অনেক ক্ষেত্রেই এই বিকাশ লক্ষ করা যায়।

এই চারটি বিশেষ রাস্তা ছাড়াও আরও একটি সামগ্রিক নীতি প্রণয়নের কথা আছে। অন্যান্য দেশে Equal Opportunity কমিশন নামে একটি বিশেষ সংস্থা আছে। ভাষা , ধর্ম , জাতি, রং, ইত্যাদি নানা কারণে যারা সংখ্যালঘু তাদের সমাজে সমান সুযোগ ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার জন্য এই কমিশন তৈরি হয়েছে। এর এক্তিয়ার শুধু সরকারি শিক্ষা ও চাকরিতে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ ও সেই সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসন নয়, সরকারি, বেসরকারি, ও সামুদায়িক সব রকম প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজের অন্যান্য ব্যাবস্থায় যেমন আবাসনে, বাজার ব্যবস্থায় অর্থাৎ সমাজ বাজার ও সরকার , সব পরিসরেই সব ধরণের সংখ্যালঘুদের সমান সুযোগ তৈরির কাজ করবে। এই বিষয়ে নীতি প্রণয়ন, কর্মসূচি তৈরি, প্রচার, গবেষণা, অভিযোগ নিরসন ইত্যাদি সব ধরণের কাজই করবে। ২০০৮ সালে ইউপিএ সরকারও সেরকম

এক প্রস্তাব এনেছিল, কিন্তু শুধু মুসলিমদের জন্য তাই সেই প্রস্তাব বেশিদূর এগোয়েনি। নীতি-কাঠামো হিসেবে এই রিপোর্টটি সত্যিই নতুনভাবে মুসলিম উন্নয়নের প্রশ্নটিকে নিয়ে ভাবার সুযোগ করে দেয়। সাধারণভাবে এই আলোচনা সংরক্ষণেই বহুদিন আটকে আছে। সংরক্ষণ পেরিয়ে সরকারি নীতির আশ্রয়েই কিভাবে এগোনো যায়, এই প্রথম তার একটা রূপরেখা পেলাম। তবে এ ব্যাপারে কিছু মন্তব্য না করলেই নয়।

প্রথমত aspirational district বলে নীতি আয়োগের যে কর্মসূচি আছে তাতে সরকারি বিনিয়োগ এতই সামান্য যে তা দিয়ে কোন এলাকারই বিশেষ কোন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। দরকার হল বিভিন্ন মন্ত্রকের যে নানা কর্মসূচি আছে, সেগুলিকে aspirational districtগুলির ক্ষেত্রে একটা ছাতার তলায় আনা ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিকাঠামো, সামাজিক উন্নয়ন ও শিল্প-বানিজ্য উন্নয়নে এবং কৃষিতে বিনিয়োগ করা। বর্তমানে এই সার্বিক বিনিয়োগকে convergence বলে চালানো হয়, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়, কারণ তাতে বিভাগীয় আমলাতান্ত্রিকতার সঙ্গে লড়াইটা থেকেই যায়। যে ধরনের বিনিয়োগের কথা বলছি তাতে আরবান ডেভলপমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, কৃষি, সড়ক পরিবহন, ব্যাঙ্ক, পানীয় জল, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, ভারি শিল্প ইত্যাদি অনেকগুলি দপ্তরের এক ছন্দে কাজ করার প্রয়োজন আছে, যা বর্তমানের আমলাতান্ত্রিকতায় সম্ভব নয়। তাছাড়া বর্তমানের ওই সব বিভাগীয় কর্মসূচিগুলি সব ক্ষেত্রে বিশেষ এলাকার জন্য পরিকল্পিত নয়, সেখানে একেবারে নতুন ভাবনার দরকার হবে। তাই এলাকা উন্নয়ন পথের যথার্থতা মেনে বলা যায়, যে উপস্থিত কাঠামোয় তা সফল হওয়া মুশকিল।

সেক্টর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই কথা। একটা বিশেষ সেক্টরকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে গেলে এক ধরণের বাণিজ্যিক ভাবনা লাগে যা সাধারণত ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স থেকে আসে, প্রশাসনিক বিজ্ঞান থেকে আসে না। তাই এই কাজটি যদি বিভাগীয় আমলাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাঁরা চিরাচরিত বিভাগীয় ভাবনায় আটকে যাবেন, তাই এখানে এক ধরণের কর্পোরেট সংস্থার দরকার যে সংস্থা সেক্টর উন্নয়নের সবরকম দিকের দায়িত্ব নেবে। সেক্টর উন্নয়ন মানে ইংরেজিতে যাকে value chain বলে তার প্রতিটি অংশের উন্নয়ন, সেটা সরকারি যোজনা কেন্দ্রিক ভাবনার বিষয় নয়। আর তৃতীয়ত সংরক্ষণ নিয়ে যে প্রস্তাব আছে সেটা ইতিমধ্যেই নানা রাজ্যে পরীক্ষিত কিন্তু যেখানে গত তিরিশ বছর ধরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ও চাকরি দুটিতেই ধারাবাহিক সংকোচন ঘটেছে সেখানে এই প্রস্তাবের নৈতিকতা মেনে নিয়েও বলা যায়, এই রাস্তা খুব বেশি মানুষের কাজে আসবে না।

এই সব অন্তরায় সত্ত্বেও নীতি কাঠামো হিসেবে এই রিপোর্টটির মূল্য অনেক তাই এই নিয়ে আরও আলোচনা হোক। আশা করা যায় তাতে রুপায়ণের রাস্তাগুলিও স্পষ্ট হবে। ❐

(লেখক আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্গালুরুর অধ্যাপক)

নয়া-ফ্যাসিবাদ একটি নোট

পলিট ব্যুরো, সি.পি.আই (এম)

নয়া-ফ্যাসিবাদের মধ্যে কিছু কিছু উপাদান রয়েছে, যা বিশ শতকের গোড়ার দিককার ফ্যাসিবাদের মতই। এগুলি হল উগ্র জাতীয়তাবাদ, যার ভিত্তি ঐতিহাসিক ভুল ও অন্যায় সম্পর্কে কল্পিত অনুভূতি, অপর-কে নিশানা করা, বর্ণভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু। এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী/নয়া-ফ্যাসিবাদী দল অথবা শক্তিগুলির পিছনে বৃহৎ বুর্জোয়ার সমর্থন। ভারতে, নয়া-ফ্যাসিবাদকে নির্দিষ্ট চেহারা দিচ্ছে আরএসএস ও তাদের হিন্দুত্বের মতাদর্শ, আমাদের পার্টির কর্মসূচি অনুযায়ী যা ফ্যাসিস্ত-ধাঁচের। Neo fascism a note ১৭-১৯ জানুয়ারি, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পলিট ব্যুরো 'নয়া-ফ্যাসিবাদ' শব্দবন্ধটির ব্যবহারের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত একটি নোট প্রকাশ করেছে, যা খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবের সঙ্গেই প্রকাশ করার কথা। যেহেতু সংবাদমাধ্যমে এই নোটটির কিছু ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, সেকারণে ওই নোটের সম্পূর্ণ অংশটি নিচে প্রকাশ করা হল।

১। খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং বিরোধীশক্তি ও গণতন্ত্রকে দমন করার লক্ষ্যে কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপের মধ্যে ফুটে উঠেছে নয়া-ফ্যাসিবাদী (নিও ফ্যাসিস্ত) বৈশিষ্ট্যগুলি। জাতীয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাজনৈতিক প্রস্তাবে এই প্রথম আমরা নয়া-ফ্যাসিবাদী শধবন্ধটি ব্যবহার করেছি।

২। এর আগে ২২তম কংগ্রেসে, আমরা বলেছিলাম কর্তৃত্ববাদী এবং হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক আক্রমণগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিকাশমান ফ্যাসিস্ত-ধাঁচের প্রবণতাগুলি। ২৩তম কংগ্রেসে আমরা বলেছিলাম, মোদী সরকার আরএসএস-এর ফ্যাসিস্ত-ধাঁচের অ্যাজেন্ডাগুলিই কার্যকর করছে।

৩। নয়া-ফ্যাসিবাদ, এই শধবন্ধটির অর্থ কী? নিও মানে নতুন, কিংবা পুরোনো কোনও কিছুর সাম্প্রতিক সংস্করণ। নয়া-ফ্যাসিবাদ শধবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে বিষয়টিকে চিরায়ত (বা ধ্রুপদী) ফ্যাসিবাদ থেকে পৃথকীকরণের জন্য। চিরায়ত ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়েছিল ইউরোপে দুটি যুদ্ধের মাঝখানের পর্বে, যেমন ইতালিতে মুসোলিনী ও জার্মানিতে হিটলারের অধীনে। এটি ছিল সেই যুগ, যখন বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকটের পরিণতিতে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে দেখা দিয়েছিল মহামন্দা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হচ্ছিল তীব্র। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুটিই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পরিণতি। ক্ষমতা দখলের পর ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিল। এবং যুদ্ধকে ব্যবহার করেছিল অস্ত্র উৎপাদন বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় হিসাবে। এই সব দেশে একচেটিয়া পুঁজি পুরোপুরি মদত দিয়েছিল ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলিকে। এবং সংকটকে

মোকাবিলার লক্ষ্যে চরম পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই শক্তিগুলির ওপর নির্ভর করেছিল।

৪। নয়া-ফ্যাসিবাদের মধ্যে কিছু কিছু উপাদান রয়েছে, যা বিশ শতকের গোড়ার দিককার ফ্যাসিবাদের মতেই। এগুলি হল উগ্র জাতীয়তাবাদ, যার ভিত্তি ঐতিহাসিক ভুল ও অন্যায় সম্পর্কে কল্পিত অনুভূতি, অপর-কে নিশানা করা, বর্ণভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু। এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী/নয়া-ফ্যাসিবাদী দল অথবা শক্তিগুলির পিছনে বৃহৎ বুর্জোয়ার সমর্থন। ভারতে, নয়া-ফ্যাসিবাদকে নির্দিষ্ট চেহারা দিচ্ছে আরএসএস ও তাদের হিন্দুত্বের মতাদর্শ, আমাদের পার্টির কর্মসূচি অনুযায়ী যা ফ্যাসিস্ত-ধাঁচের। বিজেপি শাসনে তারা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমর্থ হচ্ছে। সংকীর্ণ হিন্দুত্বের মতাদর্শ, নয়া-উদারবাদী সংকট এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষায় কর্তৃত্ববাদী শাসন চাপিয়ে দেওয়া, মিলিতভাবে সবকটিই নয়া-ফ্যাসিবাদের উপাদানসমূহের আদিরূপ।

৫। নয়া-ফ্যাসিবাদ নয়া-উদারবাদের সংকটের ফসল। এবং বিষয়টি বিশ্বজনীন। নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি বিভিন্ন দেশে মাথাচাড়া দিয়েছে এবং কয়েকটি দেশে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এখন আর তীব্র নয়, বরং স্তিমিত, আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির উত্থানের সঙ্গেই। ফলে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে নয়া-ফ্যাসিবাদী শাসকেরা এখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে না। নয়া উদারবাদী সংকট এবং সেই সংকট থেকে জন্ম নেওয়া জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে উগ্র-দক্ষিণপন্থী ও নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি। আর এজন্য তারা জনমোহিনী শধবন্ধগুলিকে ব্যবহার করছে। কিন্তু যখন তারা ক্ষমতায় আসে, তখন তারা নয়া-উদারবাদী নীতিগুলি থেকে বিচ্ছেদ ঘটায় না। বরং বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষা করার জন্য সেই নীতিগুলিই কার্যকর করে। চিরায়ত ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আরেকটি ফারাক হল এই যে, নয়া-ফ্যাসিবাদী দলগুলি নির্বাচনকে কাজে লাগায় তাদের রাজনৈতিক প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং যদি তারা ক্ষমতায় আসেও, তাহলেও তারা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে তুলে দেয় না। তারা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু বিরোধীদের দমন করার জন্য এবং নানা সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতিগুলি কাজে লাগায়। দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য রাষ্ট্রের ভিতরে সক্রিয় থেকেই তারা রাষ্ট্রকাঠমোয় বদল আনতে চায়।

৬। আমরা বলেছি, বিজেপি-আরএসএসের নেতৃত্বে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি হিন্দুত্ব-কর্পোরেট কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা, যার মধ্যে ফুটে উঠেছে নয়া-ফ্যাসিস্ত-ধাঁচের বৈশিষ্ট্যগুলি। আমরা একথা বলছি না যে মোদী সরকার একটি ফ্যাসিবাদী কিংবা নয়া-ফ্যাসিবাদী সরকার। আমরা ভারত রাষ্ট্রকে নয়া-ফ্যাসিবাদী চরিত্রের রাষ্ট্র হিসাবেও চিহ্নিত করছি না। আমরা যে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে জোর দিচ্ছি তা হল, বিজেপি আরএসএসের রাজনৈতিক শাখা এবং একটানা দশ বছরের বিজেপি শাসনের ফলে বিজেপি-আরএসএসের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত হয়েছে এবং এর ফলে নয়া-ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হচ্ছে। বৈশিষ্ট্যগুলি শব্দটির অর্থ হল, লক্ষণ বা প্রবণতা। তবে সেই প্রবণতাগুলি এখনও নয়া-ফ্যাসিবাদী সরকার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠেনি। সুতরাং রাজনৈতিক প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে, তা হল, হিন্দুত্ব-কর্পোরেট কর্তৃত্ববাদ যে নয়া-ফ্যাসিবাদের অভিমুখে চলেছে, সেই বিপদের কথা। আর এমনটা ঘটবে যদি বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলা না যায়, এবং তাদের থামানো না-যায়।

৭। এই অবস্থান সিপিআই এবং সিপিআই(এমএল)-এর থেকে পৃথক। মোদী সরকার একটি ফ্যাসিস্ত সরকার, এভাবেই চিহ্নিত করেছে সিপিআই। আর সিপিআই(এমএল) বলেছে, ভারতীয় ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় এসেছে। (প্রকাশের তারিখ ০১-মার্চ-২০২৫)❐

ভারতে ফ্যাসিবাদ চিনে নেওয়া এখন না হলে, তাহলে কখন ?

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

সিপিআই(এম)-এর আসন্ন ২৪তম কংগ্রেসের প্রাক্কালে, দলের পলিট ব্যুরো থেকে জারি করা একটি অভ্যন্তরীণ নোট মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় , আগে প্রকাশিত খসড়া প্রস্তাবের চেয়ে বেশি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। খসড়াটিতে দু'একটি জায়গায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মোদি সরকারকে বর্ণনা করতে 'নব্য-ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য' অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। নোটটি এখন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে 'নব্য-ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য' বলতে কেবল কিছু প্রবণতা বা লক্ষণ বোঝানো হয়েছে, এবং কোনোভাবেই মোদি সরকারকে ফ্যাসিবাদী বা নব্য-ফ্যাসিবাদী শাসন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। এখানেই, নোটটি উল্লেখ করেছে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে সিপিআই বা সিপিআই(এমএল)-এর পার্থক্য রয়েছে।

সম্ভবত 'নব্য-ফ্যাসিবাদ' শধটি সিপিআই(এম)-এর কর্মীদের বিভ্রান্ত করেছিল যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সিপিআই(এম) এবং সিপিআই(এমএল)-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কেবল 'নব্য' বিশেষণকে ঘিরে, তাই নোটটিকে 'স্পষ্টীকরণ' করতে বলা হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত ভারতে ফ্যাসিবাদ কেবল একটি প্রবণতা, প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল উদীয়মান এবং শাসনের প্রকৃতি নির্ধারণের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত বা নির্ণায়ক নয়। নোটটি নিশ্চিত করতে চায় যে দলীয় কর্মীরা 'নব্য-ফ্যাসিবাদী' শধটিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেয়, যা সিপিআই(এম)-এর কোনো নথিতে প্রথমবারের মতো উপস্থিত হয়েছে। অন্য কথায়, পরিস্থিতি এমন যে 'ফ' শধটি এড়ানো যাচ্ছে না, তবুও নোটটি দলকে ফ্যাসিবাদী বিপদকে 'অতিমূল্যায়ন' না করতে সতর্ক করতে চায়।

নোটটি ইতালি ও জার্মানির ফ্যাসিবাদকে 'ক্লাসিক্যাল ফ্যাসিবাদ' হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং ইঙ্গিত দিয়েছে যে নব্য-ফ্যাসিবাদের উদীয়মান প্রবণতা ক্লাসিক্যাল ধারা থেকে কীভাবে ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলির কিছু অংশ প্রাসঙ্গিক;প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতার মধ্য দিয়ে, যা বিশ্বযুদ্ধের দিকে পরিচালিত করেছিল এবং গ্রেট ডিপ্রেশনের (মহা মন্দা) নামে পরিচিত পুঁজিবাদের তীব্র সংকটের সৃষ্টি করেছিল। তবে নোটটি সেখানে থামেনি এবং আরও একটি অন্তর্নিহিত পার্থক্য চিহ্নিত করেছে;ক্লাসিক্যাল ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু 'নব্য' প্রকারটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বিশেষত নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এমনকি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অর্থাৎ, ক্লাসিক্যাল ফ্যাসিবাদের কোনো অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং এটি গণতন্ত্রের প্রতিটি অংশকে ধ্বংস করে দেওয়ার একটি ধ্বংসাত্মক ঝড় সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু নব্য-ফ্যাসিবাদী প্রকারে কিছুটা স্ব-নিয়ন্ত্রণ বা স্ব-সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ক্লাসিক্যাল ফ্যাসিবাদ এবং তার 'নব্য' রূপের মধ্যে এই পার্থক্যটি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে, যেমন সিপিআই(এম)-এর এই দাবিও যে ভারত এখন যা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করছে তা কেবল কিছু 'নব্য-ফ্যাসিবাদী প্রবণতা', যা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে ভবিষ্যতে নব্য-ফ্যাসিবাদে রূপ নিতে পারে। ১৯২০-এর দশকে ফ্যাসিবাদের উত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে, তীব্র আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সংঘাত ও অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় ছিল;বিপ্লবের ভয়। ১৮৪৮ সালেই কমিউনিস্ট ইশতেহারটি তার ঐতিহাসিক বাক্য দিয়ে শুরু করেছিল 'একটি ভূত ইউরোপকে আতঙ্কিত করছে;সেটি হল কমিউনিজমের ভূত।' ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পর এই ভূত আরও বাস্তব হয়ে ওঠে। যদিও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে বিপ্লবী সম্ভাবনা পূর্ণতা পায়নি, রুশ বিপ্লবের পঞ্চম বর্ষপূর্তির সময়ের মধ্যে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় এসেছিল।

ইউরোপে ফ্যাসিবাদের সূচনালগ্নেই এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ফ্যাসিবাদ একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা হলেও এটি বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারা গঠিত জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ প্রকাশ পাওয়ার সময়ে এটি একটি নতুন ব্র্যান্ড নাম অর্জন করেছিল;ন্যাশনাল সোশ্যালিজম বা নাৎসিবাদ। নিশ্চিতভাবেই আজ ভারতে কেউই বিংশ শতাধীর প্রথমার্ধে ইউরোপে দেখা ফ্যাসিবাদের হুবহু নকলের কথা বলছেন না। বর্তমান ভারতের মার্কসবাদী বিশ্লেষণে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে ফ্যাসিবাদের সমস্ত ঘটনার মধ্যে থাকা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেও বিবেচনায় নিতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সিপিআই(এম)-এর স্পষ্টীকরণ নোটটি বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। সিপিআই(এম) ভারত ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রগতিশীল মহলের সঙ্গে একমত যে আরএসএস ফ্যাসিবাদী। উল্লেখযোগ্য যে, তার সূচনালগ্ন থেকেই আরএসএস নোটটিতে যাকে 'ক্লাসিক্যাল ফ্যাসিবাদ' বলা হয়েছে, অর্থাৎ ইতালি ও জার্মানির মডেল থেকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে, আদর্শগত ভিত্তি, সংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য উপাদান ধার করেছে, যেখানে ভারতের মুসলিমরা জার্মানির ইহুদিদের মতো অভ্যন্তরীণ শত্রু হিসাবে চিহ্নিত। তবে উপনিবেশিক ভারত যুদ্ধ-পরবর্তী ইতালি বা জার্মানি ছিল না। ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদীরা তাদের উত্থানের কয়েক বছরের মধ্যে ক্ষমতায় এলেও, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বা সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারতের যাত্রার প্রাথমিক দশকগুলিতে তারা প্রান্তিক শক্তি হিসাবে রয়ে গিয়েছিল।

সম্ভবত বিশ্বে আর কোন ফ্যাসিবাদী প্রবণতার উদাহরণ নেই যা এত দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছে, পরিবর্তনশীল সামাজিক-রাজনৈতিক গতিশীলতার সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে আজ আরএসএস যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য উপভোগ করছে তা অর্জন করেছে। একটি ফ্যাসিবাদী শক্তি তার রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্রমবর্ধিত নিয়ন্ত্রণকে কীভাবে ব্যবহার করবে;সে তার ফ্যাসিবাদী এজেন্ডার পূর্ণরূপটি চাপিয়ে দিতে এগিয়ে যাবে নাকি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে চিরতরে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে এবং তার তথাকথিত খেলার নিয়ম মেনে চলবে? শতাধী ব্যাপী তার উত্থান-পতন, কৌশলগত পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগতি, বিশেষত গত চার দশকে তার নাটকীয় উত্থান ও একত্রীকরণের ট্র্যাক রেকর্ড দেখে কারও সামান্যতম সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আদবানির রথযাত্রার মাধ্যমে রাম জন্মভূমি প্রচারের তীব্রতা এবং ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদের ধ্বংস আমাদের সামনে সঙ্ঘ পরিবারের নির্মম ফ্যাসিবাদী নকশার প্রথম স্পষ্ট আভাস দিয়েছিল। এটি কেবল আক্রমণাত্মক সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদের উন্মাদনা ছিল না, বরং হিন্দু আধিপত্যের ভিত্তিতে ভারতের পরিচয় পুনর্নির্ধারণ এবং হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রজ্বলিত করার একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা। সিপিআই(এমএল) এই মুহূর্তটিকে ভারতের সমন্বিত সংস্কৃতি ও সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। কমরেড বিনোদ মিশ্র ও সীতারাম ইয়েচুরি আরএসএসের নকশা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে লিখেছিলেন এবং এই বাঁকবদলের আদর্শগত-রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে বাম ও প্রগতিশীল শিবিরকে সতর্ক করেছিলেন।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর বিজেপির বিচ্ছিন্নতা খুব অল্প সময়ের জন্য ছিল এবং পাঁচ বছরের মধ্যে দলটি একটি প্যান-ইন্ডিয়া জোট গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। শতাধীর শেষের দিকে ভারত ইতিমধ্যে এনডিএ শাসনের অধীনে ছিল, প্রথম অকংগ্রেসী সরকার যা পূর্ণ মেয়াদ টিকেছিল। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে বজরং দল নেতা দারা

সিং ও তার গোষ্ঠী দ্বারা গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস ও তার পুত্র ফিলিপ ও টিমোথির লিঞ্চিং এবং তিন বছর পর গুজরাটে মুসলিমবিরোধী গণহত্যা সঙ্ঘ পরিবারের ক্রমবিকাশমান এজেন্ডার স্পষ্ট সংকেত দিয়েছিল। যদিও নরেন্দ্র মোদি সরকারের তত্ত্বাবধানে গুজরাটের গণহত্যা ভারত ও বিদেশে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছিল এবং ২০০৪ সালে এনডিএ-র পরাজয় নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তবুও সঙ্ঘ-বিজেপি নেতৃত্বের নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে সঙ্ঘ পরিবার হিন্দু রাষ্ট্রের লক্ষ্যের দিকে পরবর্তী লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

যদিও ইউপিএ সরকার দুটি পূর্ণ মেয়াদ চালিয়েছিল, বিজেপি গুজরাটে নিজেকে সুসংহত করেছিল এবং কর্পোরেট ইন্ডিয়াও 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট' নামে দ্বিবার্ষিক বিনিয়োগ সম্মেলনের মাধ্যমে মোদি ব্র্যান্ডের চারপাশে ক্রমবর্ধিতভাবে জড়ো হতে শুরু করেছিল। কর্পোরেট ইন্ডিয়ার স্পষ্ট সমর্থনে মোদিকে দিল্লিতে আনার দাবি জোরালো হতে থাকে, টাটা গ্রুপও আদানি-অম্বানির কোরাসে যোগ দেয়, এবং ২০১৪ সালের মধ্যে মোদি যুগের আবির্ভাব ঘটে। কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক মিলনের এই গতিপথ ভুললে চলবে না। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতকে একটি হিন্দু আধিপত্যবাদী ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার অধীন করার সঙ্ঘের দীর্ঘকালীন এজেন্ডার ধারাবাহিক ও দ্রুত তীব্রতর বাস্তবায়ন আমাদের জানান দেয় যে নব্য-উদারবাদী সংকট যতই তীব্র হোক না কেন, এই ফ্যাসিবাদী বিপর্যয়ের নকশায় তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু রয়েছে।

প্রায় আশি বছর আগে, আম্বেডকার আমাদের সতর্ক করেছিলেন যে 'যদি হিন্দু রাজ বাস্তব হয়, তা নিঃসন্দেহে এই দেশের জন্য সর্ববৃহৎ বিপর্যয় হবে';এবং তার এই ভবিষ্যদ্বাণী আরও সত্যি হতে পারে না। আইন সংশোধন থেকে শুরু করে আইন ও ন্যায়ের কাঠামো পরিবর্তন, সংবিধানের মৌলিক চেতনার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে নতুন আইন প্রণয়ন এবং আমাদের প্রজাতন্ত্রকে পরিচালনাকারী সমগ্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিবেশকে বিধ্বস্ত করে এই সরকার গণতন্ত্র ধ্বংস ও নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার জন্য সবকিছু করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষকতায় ঘৃণা ও সহিংসতা, যা মুসলিম সম্প্রদায়, সমাজের বিভিন্ন দুর্বল অংশ এবং ভিন্নমতের প্রতি নির্দেশিত, এবং আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক ভিত্তির উপর প্রতিদিনের অভূতপূর্ব আক্রমণের চিত্র পাই। একটি নতুন সংবিধানের জন্য স্পষ্ট ডাকও বিভিন্ন মহল থেকে শোনা যাচ্ছে, এবং ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫তম বার্ষিকীর সংসদীয় আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই বাবাসাহেব আম্বেডকার সম্পর্কে অসম্মানজনক মন্তব্য করেছিলেন।

ভারতে নির্বাচন অবশ্যই এখনও হচ্ছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকলে এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুত থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধিতভাবে অস্বচ্ছ ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে কি তা ভারতের বিপর্যস্ত গণতন্ত্রের জন্য একটি বাস্তব সুরক্ষা হতে পারে? মনে রাখা যাক যে হিটলারও নির্বাচনী পথে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং ধীরে ধীরে বিরোধিতাকে অবৈধ করে ৯৯ ভোট পেয়ে একটি স্থায়ী একনায়কত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতে অমিত শাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পঞ্চাশ বছর শাসনের কথা বলছেন। আর আমরা ইতিমধ্যেই বিজেপির প্রতিটি নির্বাচন জয় ও ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মরিয়া ও অশুভ প্রচেষ্টার অগণিত উদাহরণ দেখেছি। ভারতের নির্বাচন ক্রমশ প্রহসনে পরিণত হচ্ছে, যা বৈশ্বিক প্রদর্শনীর জন্য একটি চটকদার দৃশ্য এবং অভ্যন্তরীণ বৈধতা দাবি করার মাধ্যম। এটা সত্য যে বিজেপি তার রাজনৈতিক যাত্রায় এপর্যন্ত বেশ কয়েকটি মিত্র ও সহযোগী পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক মিত্রদের সমর্থন ছাড়াও, প্রায়শই এটি নব্য-উদারবাদী এজেন্ডার পাশাপাশি 'নরম হিন্দুত্ব'-এর ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। ভিন্নমতের উপর নির্যাতন, ইসলামকে দানবায়ন, মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সহিংসতার উগ্র প্রচারণা, এবং নাগরিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্থানের ক্ষয়;এসব বিষয়ে ভারতের গণবিচারে এখনও সংবেদনশীলতা ও সোচ্চার বিরোধিতার অভাব রয়েছে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে আম্বেডকার সংবিধানকে একটি অগণতান্ত্রিক মাটির উপর গণতন্ত্রের 'উপরিকাঠামো হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। ফ্যাসিবাদী আক্রমণের মুখে গণতন্ত্রের সবচেয়ে সুসংহত ও নিবেদিত প্রবক্তা হিসেবে কমিউনিস্টদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দেওয়া এখন আরও বেশি জরুরি।

সিপিআই(এম)-এর প্রস্তাবে কিছু 'নব্য-ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য' স্বীকৃত হয়েছে, এবং নোটে বলা হয়েছে যে এগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত রাখলে বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণাঙ্গ 'নব্য-ফ্যাসিবাদে' পরিণত হতে পারে। নোটটি 'প্রোটো নব্য-ফ্যাসিবাদের উপাদান' অভিব্যক্তি ব্যবহার করে আরও সীমাবদ্ধতা যোগ করেছে;যার অর্থ সম্ভবত, 'ক্লাসিক্যাল ফ্যাসিবাদ' থেকে তিন স্তর দূরে থাকা এই 'প্রোটো উপাদানগুলি' একবিংশ শতাধীতে ফ্যাসিবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ কেস স্টাডিতে পরিণত হওয়ার আগে আমাদের এখনও সময় আছে। যদি গতিপথ নির্ধারিত থাকে এবং প্রশ্নটি কেবল ফ্যাসিবাদী বিপদের মাত্রা বা তীব্রতা নির্ণয়ের হয়, তাহলে কি কমিউনিস্টদের এই বিলাসিতা থাকতে পারে যে ইতিমধ্যে যা ঘটেছে এবং আমাদের চোখের সামনেই প্রতিদিন যা ঘটছে তা উপেক্ষা করে, মুসোলিনির ইতালি বা হিটলারের জার্মানির তুলনায় ভারতের এখনও টিকে থাকা গণতন্ত্রের মাত্রা থেকে সান্ত্বনা নেওয়ার? ভারতের বিশালতা ও স্বাভাবিক বৈচিত্র্যের কারণে এখানে ফ্যাসিবাদের ধীর ও দীর্ঘমেয়াদি উত্থান ঘটলেও, মোদি সরকার 'এক জাতি'-র অভিন্নতার ফর্মুলার মাধ্যমে এই বৈচিত্র্যকে সমতল করতে কোনো মুহূর্ত নষ্ট করছে না।

নোটে বলা হয়েছে, ভারতীয় রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র নয়। বস্তুত, কেউই বলেনি যে ভারতের রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ ফ্যাসিবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ

অত্যন্ত দুর্বল এবং গণতন্ত্রের অবশিষ্ট উপাদান বা সম্ভাবনাকে নির্মূল করার একটি প্রকৃত প্রচেষ্টা চলছে;এ সত্য কি আমরা কখনও উপেক্ষা করতে পারি? এই কারণেই আম্বেডকার ও সংবিধান, এবং এখন ক্রমবর্ধিতভাবে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার;যা সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দিয়েছিল এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় তার জ্বলন্ত অভিব্যক্তি পেয়েছে;সঙ্ঘ-বিজেপি প্রতিষ্ঠানের জন্য এতটাই বিরক্তির উৎস হয়ে উঠেছে। নীচু তলার মানুষ, যারা এই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের শিকার, নিজেদের রক্ষায় সংবিধানকে ঘিরে জড়ো হচ্ছেন। বিভাজনমূলক ও বৈষম্যমূলক নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে শাহীন বাগের প্রতিবাদ থেকে শুরু করে দলিত-আদিবাসী-বহুজনদের সামাজিক মর্যাদার উদ্বেগ এবং কর্পোরেট লুটের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক সংগ্রামের তীব্রতা;সবখানেই মানুষ গণতন্ত্রের অস্ত্র হিসাবে সংবিধানকে পুনরাবিষ্কার করছে।

ক্ষমতার শীর্ষে ফ্যাসিবাদী শক্তির এগারো বছর ধরে অনিয়ন্ত্রিত একত্রীকরণের পরেও, ভারতীয় কমিউনিস্টদের কি এই ক্রমবর্ধিত বিপর্যয়কে তার ঐতিহাসিক নামে চিহ্নিত করতে আরও অপেক্ষা করা উচিত? বিখ্যাত বব ডিলানের গানের কথা পাল্টে বলতে হয়;'কতটা বেশি ক্ষতি সহ্য করতে হবে আমাদের, তাদের ফ্যাসিবাদী নামে ডাকার আগে?' এই মুহূর্তে ফ্যাসিবাদী বিপদকে খাটো করা, বা নব্য-উদারবাদ ও কর্তৃত্ববাদের সাধারণ বিভাগ থেকে ফ্যাসিবাদী বিপদকে পৃথক করতে অস্পষ্টতা;কমিউনিস্টদের নির্বাচনী শক্তি ও নৈতিক কর্তৃত্বকে ক্ষয় করবে।

অন্যদিকে, যদি কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে;স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রগতিশীল উত্তরাধিকার ও সামাজিক সমতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে সংবিধানের গণতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপনে আম্বেডকারের র‍্যাডিকাল অবদানের পতাকা উঁচু করে, মোদি সরকারের ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণের বিপরীতে শ্রমজীবী মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত মৌলিক উদ্বেগে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহসী উদ্যোগ নেয়;তাহলে কমিউনিস্ট আন্দোলন পাল্টা আঘাত হেনে ফ্যাসিবাদীদের পিছু হটাতে পারে।

কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী জটিলতা বোঝা যায়;ঐতিহাসিকভাবে সিপিআই(এম)-এর সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি এই দুই রাজ্য। আশা করা যায়, এই দুই রাজ্যে দলের নির্বাচনী পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক চাপে সিপিআই(এম)-এর ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব চিহ্নিতকরণ ও নামকরণের দ্বিধা প্রভাবিত হয়নি। কেরালায় ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও লোকসভা নির্বাচনে সিপিআই(এম)-এর পুনরাবৃত্ত ব্যর্থতা যেমন উদ্বেগের, পশ্চিমবঙ্গে তার অব্যাহত পতনও তেমনই। আরও উদ্বেগজনক হলো সিপিআই(এম)-এর কিছু ভোটার ও প্রাক্তন সংগঠক-নেতার বিজেপির দিকে ক্রমাগত পাড়ি জমানো।

দলের স্বাধীন বৃদ্ধি ও ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, কিন্তু কি তা একটি বিস্তৃত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ঐক্য গঠনের সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিরুদ্ধে স্থাপন করা আবশ্যক? লোকসভায় দলের বর্তমান চারটি আসনের মধ্যে তিনটি তামিলনাড়ু ও রাজস্থান থেকে এসেছে;'ইন্ডিয়া' জোটের অংশ হিসাবে। আর কি কোন কমিউনিস্ট দল বর্তমান কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশ্নকে অস্পষ্ট করে নিজের শক্তি ও ভূমিকা বাড়াতে পারে? আমরা এখনও আশা রাখি, আধুনিক ভারতের এই সংকটময় মুহূর্তে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো অংশই দোদুল্যমান হবে না, এবং ফ্যাসিবাদী বিপর্যয় তার পূর্ণ রূপে আঘাত হানার আগেই আমরা একত্রিত হয়ে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রতিরোধের কমিউনিস্ট ধারাকে শক্তিশালী করে ভারতকে রক্ষা করতে পারবো।❐

লেখক সি.পি.আই (এম. এল) দলের সাধারণ সম্পাদক।

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঋত্বিক ঘটক
এক অনন্য প্রতিভা

সফদার হাসমি

১

১৯৭৬ এর ৬ ফেব্রুয়ারি, কলকাতাবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে জানতে পারলেন, ঋত্বিক ঘটক আর নেই। খারাপ খবর তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়, এই মৃত্যুর খবরও দাবানলের মত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার মানুষদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করল। দুপুরের মধ্যে দেখা গেল প্রেসিডেন্সি গভর্নমেন্ট হসপিটালের গেটে জড়ো হয়েছেন শয়ে শয়ে নানান গোষ্ঠীর ও বৃত্তির মানুষ; শিল্পী-সাহিত্যানুরাগী, কেরানী-চাকুরীজীবী, চলচ্চিত্র যন্ত্রশিল্পী-পরিচালক, মঞ্চ ও পর্দার অভিনেতা-অভিনেত্রী, রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ! বিকেল গড়িয়ে গেলে, শেষকৃত্যের যাত্রা শুরু হল। একজন অনন্য মানুষের অনন্য শেষকৃত্য। হাজারে হাজারে লোক হয়েছিল, সকলে মিলে কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত হাঁটলেন। হাঁটার সময়ে তাঁদের কণ্ঠে বেজেছিল ওঁর সবথেকে প্রিয় কয়েকটি গান।

কলকাতা ও ঋত্বিকের মধ্যে ছিল এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। তবে সত্তরের শুরুর দিকে উভয়েই এমন বদলেছিল যে আর চেনা যাচ্ছিল না। যে কলকাতা '৬৬-র খাদ্য আন্দোলন দেখেছে, '৬৭-র যুক্তফ্রন্ট সরকার দেখেছে, সিপিআই(এম) - নকশাল সংঘাত দেখেছে, '৭২ এর ভুয়ো নির্বাচন দেখেছে, সেই কলকাতা সত্তরের মাঝামাঝি এসে ধুঁকছিল যেন। শহরের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঋত্বিকের নাড়ির স্পন্দনও ক্রমশই ঊর্ধ্বগামী। ১৯৭২ এর সেই ভয়াবহ কারচুপির পর বাইরের দুনিয়া মনে করেছিল কলকাতাতেও বুঝি জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। তবুও, যখন শহরের সন্তান বরাবরের মত এই শহর ছেড়ে যেতে বসেছে, তখন কিন্তু কলকাতার মানুষ সেই আতঙ্কের ছায়া থেকে বেরিয়ে তার সেই সন্তানকে এক মর্মস্পর্শী বিদায় জানাতে সমবেত হয়েছিল।

১৯৮২ সালে ঋত্বিকের প্রথম ছবি ত্নাগরিকদ-এর তিরিশ বছর পূর্ণ হয়। অনেকেই মনে করেন, এই ছবি থেকেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের উত্তরণের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। যদিও অনেকেই হয়তো এ কথাও মেনে নেবেন, তাঁর বানানো যেকোনও ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সোনা-রুপোর ময়ূর বিজেতাদের কাজকে ম্লান করে দিতে পারলেও, তাঁর ছবিগুলো জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বা আন্তর্জাতিক স্তরে যথাযথ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছুই করা হয় নি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তরফে এই ধরনের কলঙ্কময় বিমাতৃসুলভ আচরণ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং তা কেবল ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের ঐশ্বর্য্য বিশ্বের সামনে প্রকাশ করার জন্য নয়, সবার কাছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মর্যাদা ও শিল্পসুষমা গর্বভরে প্রমাণ করার লক্ষ্যে।

১৯৫৫ সালে বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সমালোচকেরা হঠাৎ করে নড়েচড়ে উঠে দেখলেন সত্যজিৎ রায় নামের নতুন এক প্রতিভাকে, যাঁর প্রথম কাজ, 'পথের পাঁচালি' পূবের নতুন বাতাসের মতো সর্বত্র প্রশংসিত হল। অচিরেই তিনি একাধারে চলচ্চিত্রের এক নতুন নন্দনতত্ত্বের স্রষ্টা, পথপ্রদর্শক, ও সর্বজনগ্রাহ্য বিশারদ হিসেবে গণ্য হলেন। তারপর প্রায় পঁচিশ বছর কেটেছে, এখন সত্যজিৎ রায়ের জগতজোড়া খ্যাতি, একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার বলে তিনি পরিচিত। তাঁর কাজ দেশে-বিদেশে অসংখ্য কমবয়েসি চলচ্চিত্রকারদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, অনেকে মনে করেন তিনি আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের অভিমুখ নির্দেশকারী একজন।

এসবের আড়ালে, বাণিজ্যিক ও অভিজাত গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত যে সুচারু প্রক্রিয়ায় যেকোনও বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টাকে যেনতেন প্রকারে প্রতিহত ও দমন করা হয়, সেই উপায়েই বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছিল একটি ঘটনা। 'পথের পাঁচালি' দিনের আলো দেখার অন্ততঃ তিন বছর আগেই চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সম্পদতুল্য ছবি শেষ করে ফেলেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবচেয়ে চমকে দেওয়া প্রতিভা। তাঁর নাম ঋত্বিক ঘটক, ছবির নাম 'নাগরিক'। তৈরির পর পঁচিশ বছর ধরে ছবিটি কোনও স্যাঁতসেঁতে গুদামে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে রইল, চিরকালীন বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে থাকার ভবিতব্য নিয়ে।

সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সুবাদে, হালে এই ১৯৭৭ সালে, স্রষ্টার মৃত্যুর এক বছর বাদে সেই ছবি পুনরুদ্ধার করে একটি প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব হল। তারও পরে, ভারতের নানান শহরে ছবিটির প্রদর্শনী চলাকালীন লোকজন বুঝতে পারল ঋত্বিকের পরবর্তী কর্মজীবনের প্রতি কী পরিমাণ অবিচার করা হয়েছে। আর ১৯৫২ সালে এই ছবিটির মুক্তি আটকে দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অগ্রগতির পথে কী অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঋত্বিক ঘটকের জীবন বরাবরই টালমাটাল, বিপর্যস্ত। তাঁর জীবনব্যাপী তিনি আরও সাতটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও অনেকগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি শেষ করেছিলেন। সারাজীবনে কখনওই তিনি ক্ষমতাসীন শাসকের জ্বালাতন থেকে অব্যাহতি পাননি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি,'সুবর্ণরেখা' মুক্তি পাবার আগে তিন বছর ঠাণ্ডাঘরে পড়েছিল। ১৯৭০ সালে বানানো 'আমার লেনিন' নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ১৯৭১ সালে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেলেও, জনসাধারণের জন্য এখনও মুক্তি পায়নি। এমনকি তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি, তক্ক, গপ্পো' (১৯৭৪), সেন্সর বোর্ডে বিস্তর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।

প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাজকে চেপে দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। এই প্রবণতা অনেকদিনের। সে সুদীর্ঘ যন্ত্রণার কাহিনি এখানে বলতে চাইনা। এর থেকেও উদ্বেগজনক ও ভয়ংকর প্রবণতা দেখা যায় আর এক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ায়। চলচ্চিত্র নিয়ে যাঁরা পত্রপত্রিকায় লিখে থাকেন, যাঁদের গালভরা পরিচয় হল চিত্র সমালোচক, তাঁরা ঋত্বিককে একাধারে একজন চরম স্ট্রাকচারালিস্ট ও অন্যদিকে এক রহস্যময় ও স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখান। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি সুচতুর ভাবে সাজানো হয় ঋত্বিকের কাজ ও তার গুরুত্বকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে।

ঋত্বিকের কাজের আলোচনায় এহেন 'সমালোচকের' যাবতীয় চেষ্টা এসে পুঞ্জীভূত হয় কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের ব্যাকরণে তাঁর অবদানের কথা দায়সারা ভাবে বলে নিয়ে, পরক্ষণেই 'এই অসামান্য শিল্পীর প্রতিভার ঝলকানি' থেকে তাঁর অপেক্ষাকৃত উপেক্ষাযোগ্য সাংগঠনিক কাজের পরিত্যক্ত পাঁককে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোতে।

সমালোচনার আর একটি ধারা রয়েছে, যেটিও সমান ক্ষতিকর, সেখানে একটি অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী অবস্থান থেকে সমালোচক প্রমাণ করতে চান, বৌদ্ধিক ঋত্বিকের দায় তাঁকে যে সাংগঠনিক চিন্তাধারা অবলম্বন করতে 'বাধ্য' করেছিল, চলচ্চিত্রকার ঋত্বিকের সংবেদনশীলতা তাঁর ছবির বিষয়কে সেই ভাবনার নিগড় থেকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্য এক পরিসরেও এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি দেখা গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই ঋত্বিককে কমিউনিস্ট পার্টিতে একজন বিদ্রোহী হিসেবে দাঁড় করানোর এক প্রবণতা চলেছিল, যে বিদ্রোহী চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নানান আদর্শবাদী ও তাত্ত্বিকদের বজ্রকঠিন অনুশাসনের বিরুদ্ধে লড়েছে। ঋত্বিকের এই মাতাল ও আপাত-নৈরাজ্যবাদী আচরণকে দেখা হয়েছিল আইপিটিএ-র নেতাদের দ্বারা সৃজনশীল শিল্পীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের একটি ধরন হিসেবে। এর পাশাপাশি শিল্পীদের ব্যক্তিত্বের উপর এসে পড়া অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আবদ্ধ হতে তাঁর অস্বীকৃতি হিসাবেও তাঁর ব্যক্তিগত আচরণকে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

এই সমালোচকরা হয় বুঝতে ব্যর্থ হন অথবা স্বীকার করতে চান না, এই মানুষটি তাঁর জীবনভর এই চলচ্চিত্র বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এবং নতুন সিনেমার প্রচার ও পৃষ্ঠপোষক সরকারি সংস্থাগুলির কর্তাব্যক্তিদের কোপে পড়েছেন। ওঁদের অনিশ্চয়তা এবং তার থেকে

উদ্ভূত অসীম বঞ্চনার ফলে জীবনভর তাড়া খেতে হয়েছে তাঁকে। এই লাগাতার মানসিক নির্যাতনই তাঁর মতো এক অত্যন্ত সংবেদনশীল ব্যক্তি, কবি, পণ্ডিত ও শিল্পীকে এই বাণিজ্যিক দানব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্পজগৎ থেকে এক ধরণের স্ব-আরোপিত নির্বাসনে নিয়ে যায়। এমন নির্বাসন যা তাঁকে বেশ কয়েকবার মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। আরও যা এই সমালোচকরা বুঝতে বা স্বীকার করতেও ব্যর্থ হন তা হল, এই ধরণের অসহনীয় নির্যাতন সত্ত্বেও ঋত্বিক বারবার এমন চলচ্চিত্র তৈরি করতে এগিয়ে এসেছেন, যা পরবর্তী কালের জন্যও পাথেয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যখন সত্তর ও আশির দশকের ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়ছি, তাঁর ছবি উদ্বুদ্ধ করছে আমাদেরও, আমাদের প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন তিনি।

কাজেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কঠিন অনিগড়েরদ বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া তো দূরের কথা, ঋত্বিক বরং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনেক প্রাক্তন খ্যাতিমান ব্যক্তিকেও অনুসরণ করেননি। তিনি সর্বদাই এমন কোনও মাধ্যম বা বার্তার প্রতি অবিচল থেকেছেন যেগুলি মানুষের সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ এবং শিল্পের পরিসরে মানুষের সংগ্রামকে বহন করতে সক্ষম। তিনি কখনও তাঁর শিল্পকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের অনুগ্রহপ্রার্থী করে তুলতে চাননি, নিজেও কোনও রকম চাকচিক্য অথবা ধন-সম্পদের আকর্ষণের শিকার হননি কোনও দিন। নিজের ছবির জন্য কখনও সস্তা জনপ্রিয়তাকে অবলম্বন করেননি। আমাদের আজকের অনেক তথাকথিত 'বিপ্লবী' চলচ্চিত্রকাররা জনপ্রিয় হবাব. জন্য যেসব চোরাপথ ব্যবহাব করে থাকেন, তিনি সেসব সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। (পরের সংখ্যায়)

স্মরণ : গানের গেরিলাযোদ্ধা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

প্রতুল মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। এখন বাঙালি তাঁকে চেনে 'আমি বাংলায় গান গাই' এর স্রষ্টা এবং গায়ক হিসেবে। এই গানই তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা দিয়েছে সারা পৃথিবীর বাঙালির কাছে। যদিও যে উগ্র বাঙালিয়ানা দিয়ে এই গানকে উদযাপন করা হয়, সেই উগ্রতা এই গানের মর্মবস্তু নয়। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলও প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে এই গানেই আটকে রাখতে চায়। তাঁদের কাছে প্রতুল মুখোপাধ্যায় মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসা সহাস্য মানুষটির ছবি। মমতা বিরোধীদের বড়ো অংশের কাছেও প্রতুল এখন মমতার পাশে বসা সহাস্য মানুষটি, ফলে তীব্র নিন্দনীয় মানুষ। ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে মৃত্যুসংবাদ আসার পর 'বাঙালি প্রতুল' আর 'তৃণমূল প্রতুল'-এ ছেয়ে আছে ফেসবুক। আসল প্রতুল মুখোপাধ্যায় মানুষের আড়ালে চলে গেছেন। হয়ত তাঁর নিজের কাছেও অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর ভেতরের মানুষটি। তাঁর একসময়ের আগুনে সতীর্থদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। মন্ত্রী এবং তাদের সান্ত্রীরা মিলে প্রতুলের মৃতদেহটি এমনভাবে আগলে রেখেছে যে তাদের পছন্দের মানুষ ছাড়া নাকি কেউই কাছ ঘেঁষতে পারে নি এসএসকেএম হাসপাতালে। আজকাল এমনটা হয়েই থাকে। আমরা বোধহয় আর আশ্চর্য হই না।

যে প্রতুলকে নিয়ে ফেসবুক মুখর, যে প্রতুলকে নিয়ে শাসক সদাতৎপর, সেটা তো বাজারের তৈরি প্রতুল। শাসকের তৈরি প্রতুল। হয়ত তাঁর নিজেরও তৈরি সেই প্রতুল। ইতিহাসের কাছে সেই প্রতুল একটি ক্ষণকালের সত্য মাত্র। তবে এই খণ্ডিত প্রতুলেও প্রকৃত প্রতুল লুকিয়ে আছেন। 'আমি বাংলায় গান গাই' কারো বিরুদ্ধে রচিত গান নয়। এই গানে কোনো শাসকেরই রাগ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই গান যেভাবে তিনি পরিবেশন করেন বা যে সঙ্গীত ভাষায় নির্মিত হয়েছে এই গানের শরীর, সেটা একান্তভাবেই 'প্রকৃত' প্রতুলের। যন্ত্র নেই, যন্ত্রী নেই, একাধিক মাইক্রোফোন নেই। একটি একলা মানুষ দু'হাত ওপরে তুলে, কখনো সামনে বাড়িয়ে নিরাভরণ উপস্থাপনায় শ্রোতার আসরে হাজির করেন এই গানকে।

এই সঙ্গীতভাষাটি শাসক ঘনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠান লেপ্টে থাকা শিল্পের ভাষা নয়। এই ভাষা একজন নিরস্ত্র গেরিলাযোদ্ধার ভাষা। এই ভাষাটি নির্মিত হয়েছে অসংখ্য যন্ত্রের ঝংকারে সমৃদ্ধ মূলধারার সঙ্গীতের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে শামিল হয়ে। যে ধরনের গানকে বাজার, রাষ্ট্র, পুঁজি পৃষ্ঠপোষকতা করে প্রতুল সেই গান গাইতে আসেন নি। সমাজ বদলের লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম ছিল তাঁর গান গাইবার প্রেরণা। গোপন সভায় গাওয়া গান, কারখানার গেটে গাওয়া গান, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার মুহূর্তে বুকের ভেতর বেজে ওঠা গান, কারান্তরালে বন্দীদশায় গলায় উঠে আসা গান সেই গানই তৈরি করেছেন। রাজনীতির সেই পথের ভুল শুদ্ধের বিচার করছি না। প্রয়োজনও নেই। একটি ছোট্ট অংশ ব্যতিরেকে সেই আন্দোলনের অধিকাংশই পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সেই সংগ্রামের ডাকটি ছিল হঠকারিতা। কিন্তু ওই আন্দোলনের আঁচে শিল্প সংস্কৃতির জগতে যে ঝড়ের ঝাপট লেগেছিল সেটা নাটকে গানে কবিতায় নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছে। বাদল সরকারের নাট্যভাষা এই সংগ্রামেরই ফসল।

প্রতিবাদী গানেও সেই সময়ে নতুন নতুন স্রষ্টা নতুন ভাষা মেজাজ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রতুল এই ধারার একজন হয়েও সকলের চেয়ে ছিলেন স্বতন্ত্র। কণ্ঠের মিষ্টত্ব যে বিপ্লবের জোরালো আহ্বানে সহায়ক হতে পারে এটা এক অর্থে অভাবনীয়। গণসঙ্গীত মানেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বরের চিরপরিচিত ছাঁচের চেয়ে একেবারেই আলাদা। অথচ কী জোরালো উপস্থাপনা। একজন সফল গেরিলাযোদ্ধার মতই অসংখ্য অনতিক্রম্য প্রতিকূলতাকে পেরোতে হয়েছে তাঁকে। দেখতে ছোটখাটো মানুষ, কণ্ঠস্বর পাতলা, যন্ত্রী বা যন্ত্রের উপকরণকে সঙ্গে নেওয়ার সামর্থ্য নেই, এমন একটি পরিস্থিতির সাথে যুদ্ধে রত হয়েই তাঁর সঙ্গীতভাষাটি তিনি সৃষ্টি করেছেন। আজ মারা যাওয়ার পর

থেকে বারবারই মনে হচ্ছে এই কথাটি, তিনি রাজনৈতিক সঙ্গীতের গেরিলাযোদ্ধা। ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামে সাধারণ বন্দুককে সম্বল করে গেরিলাদের যুদ্ধে নামতে হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এক অসম্ভব অসম যুদ্ধ। অথচ সেই যুদ্ধে না নেমে হত না। ফলে নিত্যদিন ভিয়েতনামের গেরিলাযোদ্ধাদের সন্ধান করতে হয়েছে, উদ্ভাবন করতে হয়েছে নতুন নতুন যুদ্ধভাষার। ওই অসম যুদ্ধের সংগ্রামে তাঁরা যে রণকৌশলগুলি উদ্ভাবন করেছিল তা পৃথিবীর সমর বিজ্ঞানের জ্ঞান ভাণ্ডারে সম্পদ হয়ে আছে। সহায় সম্বলহীন দুর্বলের অসম যুদ্ধে সেগুলি এক বিশাল অনুপ্রেরণা। প্রতুলদা গানে সুর কথা পরিবেশনা মিলিয়ে যে ভাষাটি তৈরি করেছেন সেটা ওই গেরিলাযোদ্ধাদের যুদ্ধভাষার মতই বাজারকে প্রত্যাখান করে গানের বিকল্প পথে হাঁটার স্বপ্ন দেখা প্রান্তিক যোদ্ধাদের কাছে এক বিরাট অনুপ্রেরণা। প্রশ্ন উঠবে 'কিছু নেই' এর হতাশাকর বাস্তবতায় কীসের জোরে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

গেরিলাযোদ্ধা আর গেরিলা গায়ক, দুইয়ের ক্ষেত্রেই উত্তর অভিন্ন। প্রত্যয় ও প্রাণশক্তি। ব্যবস্থাপনা বিদ্যায় বলা হয়ে থাকে প্রতিকূলতাকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করার কথা। প্রতিকূলতা থেকেই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারার প্রত্যয়। এই প্রত্যয় থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রতুলের গান যা শুধু প্রতিবাদী গানে এক নতুন ভাষা এনেছিল তাই নয়, নয়ের দশকে যখন সুমনের আবির্ভাবের সূত্রে মূলধারায়ও ফিরে এলো তাঁর গান, তখন দেখা গেল এই নিরাভরণ সঙ্গীত সচকিত করে দিয়েছে আপামর বাঙালিকে। বাজার আসল প্রতুলকে ভয় পায়, তাই তাঁকে 'আমি বাংলায় গান গাই'-এ আটকে রেখেছে। মমতার পাশের সহাস্য ছবিতে সীমাবদ্ধ করেছে।

আমাদের প্রতুল 'ডিঙ্গা ভাসা সাগরে'র প্রতুল, 'ভয় পাস নে ছেলে'র প্রতুল, 'আলু বেচো ছোলা বেচো'র প্রতুল। এই প্রতুলকে সঙ্গে নিয়েই 'আমাদের যেতে হবে দূরে, বহু দূরে'। ❐

(শিলচরের দৈনিক বার্তালিপির সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

সাম্প্রদায়িক ট্রল ব্রিগেডকে জাভেদ আখতার অসাধারণ জবাব দিলেন

শুভাশিস মজুমদার

প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার এবং গীতিকার জাভেদ আখতার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের জয়ের পর বিরাট কোহলির প্রশংসা করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে মন্তব্য করার পরেই হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক ট্রল ব্রিগেড তাঁকে টার্গেট করে কুৎসিত মন্তব্য করতে থাকে। জাভেদ আখতার এই প্রতিটি মন্তব্যের একের পর এক কঠোর ভাষায় জবাব দেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দল ছয় উইকেটে জিতেছে। এই ম্যাচে বিরাট কোহলি তাঁর ৮২ তম সেঞ্চুরিটি করেন এবং ভারতকে জিতিয়ে আনেন। আখতার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কোহলির প্রশংসা করে একটি পোস্ট শেয়ার করেন,'বিরাট কোহলি, জিন্দাবাদ!!! আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে খুব গর্বিত।' এর পরেই শুরু হয়ে যায় জাভেদ আখতারকে টার্গেট করে ট্রল করা। জনৈক হিমাংশু জৈন (মোদি কা পরিবার) ট্যুইট করেন, 'বাবর কে বাপ কোহলি হ্যায়.... বোলো জয় শ্রী রাম।' জবাবে ক্ষুব্ধ আখতার বলেন, 'ম্যায়নে তো সির্ফ ইয়ে কাহ্নঙ্গা কে তুম এক নিচ ইনসান হো অর নিচ হি মরোগে। তুম ক্যা জানো দেশ প্রেম ক্যা হোতা হ্যায়।' ('তুমি একজন ঘৃণ্য ব্যক্তি এবং ঘৃণ্য অবস্থাতেই মারা যাবে। তুমি দেশ প্রেম সম্পর্কে কি জানো?')।

আখতার আরো বলেন, 'তুমহারি মেসেজ সে পাতা লাগতা হ্যায় কে ক্যায়সে মা বাপ কি অওলাদ হো ওর তুমহারে পরিবার নে তুমকো কেয়া সংস্কারি দিয়ে হ্যায়।' ('তোমার মন্তব্য থেকে বোঝা যায় তুমি কেমন পরিবারের সন্তান এবং তোমার পরিবার তোমাকে কি শিক্ষা দিয়েছে !') জনৈক 'প্রফেসর সাহাব' জাভেদ আখতারকে আক্রমণ করে ট্যুইট করে,'আজ সুরজ কাহা সে নিকলা...আন্দার সে দুখ হোগা আপকো তো।' ('আজ সূর্য কোথা থেকে উঠলো। মনে মনে নিশ্চয়ই আপনি দুঃখ পেয়েছেন।')

তখন গীতিকার-লেখক পাল্টা জবাব দেন, ক্ষ্মবেটা যব তুমহারে বাপ দাদা আংরেজ কে জুতা চাট রহে থে তব মেরে আজাদি কে লিয়ে জেল অর কালা পানি মে থে। মেরি রগো মে দেশ প্রেমিও কা খুন হ্যায় অর তুমারে রগো মে অংরেজ কে নওকারোঁ কা খুন হ্যায়। ইসস অন্তর কো ভুলো নেহি।' ('পুত্র, যখন তোমার বাবা এবং দাদু ব্রিটিশদের বুট চাটছিলেন, তখন ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার জন্য আমার (পূর্ব পুরুষ) জেলে আর দ্বীপান্তরে ছিলেন। আমার শিরায় দেশপ্রেমিকদের রক্ত আছে, তোমার শিরায় ব্রিটিশ চাকরদের রক্ত আছে। এই তফাৎ ভুলো না।') এর জবাবে ওই 'প্রফেসর সাহাব' কুৎসিত গালাগালি করে মন্তব্য করে। জবাবে জাভেদ আখতার লিখেছেন,'কাভি কাভি তুমহরে জয়সে গন্দে কিরে কো পায়ার কে নিচে কুচলা পড়তা হ্যায়। ম্যায় তুম জ্যায়সা কো আচ্ছি তারাহ্ জনতা হু। দুনিয়া মে না ইজ্জত মিলি না নাম মিলা। আব আপনা ফ্রাস্ট্রেশন ইধার উধার নিকলতে রাহেত হো। দুসরা য়ে কে তুমারে জ্যয়সা জলিল আপনে নামকে আগে প্রফেসর কবসে লাগানে লগে হ্যায়। অর মূর্খ ইসকি স্পেলিং তো ঠিক করলো।'

জাভেদ আরো লেখেন,'তু জিতনা গন্দি বাত করে গা উতনা মুঝে পাতা চলেগা কে তু কিতনা নিচ অর ছোটা আদমি হ্যায়। সাচ তো য়ে কে তু কুছ নেহি হ্যায় ইয়েহি দুখ হ্যায় তেরা। মুঝে তারাস আতা হ্যায় তুঝ পর।' দেশ ভাগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবে জাভেদকে তাঁর মুসলিম পরিচয়ের জন্য এক ব্যক্তি (আশীষ গাদোয়া) আক্রমণ করায় জাভেদ বলেন, তিনি এক জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার পরিবারের সন্তান, যাঁরা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। তিনি একজন ধর্ম নিরপেক্ষ এবং গর্বিত ভারতীয় নাগরিক।

অনেকে মন্তব্য বিভাগে জাভেদ আখতারকে সমর্থন করেছেন এবং এই ধরনের খারাপ মন্তব্যকে উপেক্ষা করতে বলেছেন। নাস্তিক হিসেবে পরিচয় দিলেও আখতার প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় একই ধরনের মন্তব্যের শিকার হন। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক ইকোসিস্টেম দেশ জুড়ে এই ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে।

২০১৬, মার্চ মাসে সংসদ থেকে অবসর নেওয়ার দিন জাভেদ আখতার বিজেপি সরকারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, দেশ জুড়ে 'ফ্রিঞ্জ শক্তি' ক্রমশ বড় দলে পরিণত হচ্ছে। এক নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। তিনি বলেছিলেন, সংবিধান আমাদের শক্তি, তাকে যথাযথ মর্যাদায় রক্ষা করা উচিত। ভারতের গণতন্ত্র গভীরে প্রতিথো। তবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে ধর্ম নিরপেক্ষতাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, হায়দরাবাদের একজন মহল্লার নেতা নিজেকে ন্যাশনাল লিডার ভাবেন, এবং ঘোষণা করেছেন যে তিনি 'ভারত মাতা কি জয়' বলবেন না। কারণ সংবিধানে এর বাধ্যকতা নেই। জাভেদ বলেন, ভারত মাতা কি জয় বলা আমার অধিকার। এবং তিনি এই ধ্বনি বার বার দেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কিছু শক্তি আজকাল মুসলিমদের লক্ষ্য করে স্লোগান দেয়, 'মুসলিমদের জায়গা হয় পাকিস্তান, নয় কবরস্থান,' এটা নিন্দনীয় এবং তিনি এর বিরুদ্ধে। এর আগে পাকিস্তানে সফরকালীন জাভেদ আখতার এক অনুষ্ঠানে কোনো রাখঢাক না করেই বলেছিলেন, আমরা মেহেদী হাসানকে ভারতে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। আপনারা লতা মঙ্গেশকরকে পাকিস্তানে এনে অনুষ্ঠান করেন নি কেন? পাকিস্তান থেকে পাঠানো আতঙ্কবাদী মুম্বাই শহরে আক্রমণ করেছিল, যা নিয়ে ভারতবাসীদের ক্ষোভ রয়েছে। জাভেদ আখতারের উপর সামাজিক মাধ্যমে কটু ভাষায় এই আক্রমণ দেখিয়ে দেয়, সাম্প্রদায়িক শক্তি কত বেপরোয়া !

কঙ্গনা রানাউত ক্ষমা চাইলেন জাভেদ আখতারের কাছে অভিনেতা কঙ্গনা রানাউত ২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, বিশেষ মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রবীণ গীতিকার জাভেদ আখতার দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা চার বছরের বেশি মানহানির মামলাটির সমাধান করেছেন। বহু বিতর্কিত এই বিজেপি এমপি চিত্রনাট্যকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন 'অসুবিধা' সৃষ্টির জন্য। জাভেদ আখতার ২০২০ সালে কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন যে কঙ্গনা অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর সাথে তাঁর (জাভেদের) নাম টেনে এনে তাঁর সম্মানহানি করেছেন এবং ক্ষতি করেছেন। তিনি আরো বলেছিলেন, তিনি এই নিয়ে যথেষ্ট চাপে ছিলেন। ❐

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে হবেন তা সর্বদা প্রধানমন্ত্রী মোদীই ঠিক করবেন

শুভ মিত্র

নির্বাচন কমিশন নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে শুনানি হওয়ার ঠিক দেড়দিন আগে বিজেপি সরকার তড়িঘড়ি করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও আরও একজন নির্বাচন কমিশনের সদস্য নিয়োগ করল। উল্লেখ্য যে এই সরকার কিছুদিন আগে নির্বাচন কমিশনের সদস্য নির্বাচনের নতুন পদ্ধতি ঠিক করেছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে। পূর্বে এই নিয়োগ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধী দলনেতা ও দেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।এর ফলে কোন একটা দল পরিচালিত সরকারের নির্বাচন কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ কম থাকত। গণতন্ত্রে এই পদ্ধতিটির সমালোচনা করার জায়গা থাকত না যদি না প্রধান বিচারপতি সরকারপক্ষের জো হুজুর না হয়ে উঠতেন। যদিও বিগত একদশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে প্রধান বিচারপতি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও বিরোধে যান নি বরং সহমত পোষণই করছিলেন। এই পদ্ধতির মধ্যে গণতান্ত্রিক একটা পরিবেশ ও শিষ্টাচার ছিল।

কিন্তু মোদী এই ব্যবস্থার ওপর ভরসা করতে পারেননি। ২০২৩ সালে সংসদে একটি বিলের মাধ্যমে এই পদ্ধতি পাল্টে দিয়ে প্রধান বিচারপতির জায়গায় সরকারের এক মন্ত্রীকে নিয়োগ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। উদ্দেশ্য একটাই নির্বাচন কমিশনকে কুক্ষিগত করা ও নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে দীর্ঘদিন বেআইনিভাবে ক্ষমতায় থাকা।

রাহুল গান্ধী সংসদে এর বিরোধীতা করেছেন এবং তার আগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই পদ্ধতিটির বিরোধীতা করেছেন।সেদিন বৈঠকে এই নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানান রাহুল গান্ধী। এর পর মাঝরাতে সরকার একটি বিবৃতিতে জানায় যে রজীবকুমার অবসর নেওয়ার পর তার জায়গায় জ্ঞানেশকুমারকে নিয়োগ করা হল। এবং একইসঙ্গে জ্ঞানেশকুমারের পদে বিবেক জোশীকে নিযুক্ত করা হল।

এই ঘটনা প্রমাণ করে বিজেপি কতটা মরিয়া। দেশের শিক্ষা,সংস্কৃতি,ক্রীড়াসহ বিভিন্ন স্বাধীন সংস্থার বেশীরভাগকে ইতিমধ্যে আরএসএস তাদের নিজস্ব মতবাদের লোকজনকে বসিয়ে দখল করে নিয়েছে। বিচারবিভাগকে দখল না করলেও রন্জন গগৈ,অরুন মিশ্র বা চন্দ্রচুড় বা খানুউইলকর - দের মত বিচারপতিদের অবসরের পর বিভিন্ন লাভজনক পদে নিয়োগের লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে মনোমত রায়দান করিয়ে নেওয়ার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে ঘটেছে।

রাহুল গান্ধী তার চিঠিতে লিখেছেন যখন সরকারের দুজন কমিটিতে থাকেন তাহলে বিরোধী নেতাকে রেখে কি লাভ? সরকারপক্ষ তো সবসময়ে ২-১ ব্যবধানে নিয়োগ করার মত

জায়গায় থাকবে। সেক্ষেত্রে সরকার যখন তিনজনের নিয়োগ কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তখন তো বিরোধী দলনেতাকেও বাদ দিয়ে দিতে পারত। তিনি বলেছেন যে মামলার শুনানি অতি শীঘ্র হতে চলেছে সেখানে এত দ্রুততার সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কি প্রয়োজন ছিল যখন সামনে কোন নির্বাচন নেই। তিনি এই ঘটনাকে অসম্মানজনক ও অসৌজন্য বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এই জ্ঞানেশকুমার অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও সমবায় দপ্তরের আধিকারিক হিসাবে কাজ করেছিলেন। অমিত শাহের অতি বিশ্বাসভাজন হিসাবে তার খ্যাতি রয়েছে।কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপ ও রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। বস্তুত অমিত শাহ্ই যে আগামী ২০২৯ সাল পর্যন্ত নির্বাচনকমিশনচালাবেতা নিশ্চিত করার জন্যই এই পদক্ষেপ করল সরকার সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে। ২২ টি রাজ্যে নির্বাচন তার নেতৃত্বেই ভোট লুঠ হবে। যেমন মহারাষ্ট্র বা হরিয়ানার মত রাজ্যে হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে গত পাঁচ বছরে ভোটার বেড়েছে ৪০ লক্ষ আর বিধানসভার ভোটের আগে পাঁচ মাসে ভোটার বাড়ল ৪০ লক্ষ। উল্টোদিকে দিল্লীতে গত চার বছরে ভোটার বেড়েছে চার লক্ষ এবং গত সাত মাসে ভোটার বাড়ল চার লক্ষ। এই ঘটনা কি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করে? যখন বিদায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এইসবের কোন সন্তোষজনক জবাব না দিয়ে উল্টে বিরোধী দলগুলির উদ্দেশ্যে কামান দেগে গেছেন। ❐

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর পুঁজিবাদী সংকটের গভীরতা বৃদ্ধি

সৌর বসু

ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় এসেছেন ২০২৫ সালের পর২০ জানুয়ারি। তারপর মাত্র এক মাস এক সপ্তাহ অতিক্রম হয়েছে।। এই সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে তিনি যেসব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার ফলে, ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকা এশিয়ার রাষ্ট্রনায়করা তার হঠকারী সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে। বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থা সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নিউ ইয়র্ক টইমসের একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, কানাডা চীন এবং মেক্সিকোর উপর ব্যাপক শুল্ক আরোপের ফলে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

মার্কিন অর্থনীতিবিদদের, অনেকে মনে করছেন যে এই শুল্কনীতি আমেরিকার অর্থনীতির পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আমেরিকার শিল্প কাঠামোর উপর আঘাত হানতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর রপ্তানি যোগ্য পণ্যের উপর চড়াহারে শুল্ক চাপানোর কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। জন হপকিন্স স্কুল অফ এডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের এক অধ্যাপক মন্তব্য করেছেন যে, অনেকদিন ধরেই আমেরিকার ঘনিষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল চীন , ট্রাম্পের শুল্কনীতি চীনের কাজকে অনেক সহজ করে তুলবে। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের ট্রেজারি সেক্রেটারি সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সহযোগীরা মনে করেন যে, কর বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই ,তবে তা সুচিন্তিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ট্রাম্পকে তারা ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে নিউ ইয়র্ক টাইমস এ প্রকাশ পেয়েছে। শুল্ককে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার নেতিবাচক দিক সম্পর্কে তারা ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন অর্থনীতিবিদদের অভিযোগ, তিনি দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে, মুক্ত বাণিজ্যের ধারা বহন করে চলেছিল তার পরিবর্তন করতে চাইছেন। তার এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে একদিকে তিনি মার্কিন দেশের উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য অবাধে রপ্তানি করতে চাইছেন ,অন্যদিকে অন্য দেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে তিনি শুল্কের প্রাচীর তৈরি করছেন। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতিরা এবং ইউরোপ সহ এশিয়ার দেশগুলি র রাষ্ট্রনায়কেরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মধ্য প্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইল এবং প্যালেস্তানিয়দের মধ্যে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী। ইসরাইলকে তিনি বোমা বর্ষণ থেকে বিরত হতে বলছেন এবং ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলি যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ইসরাইল আক্রমণের ফলে যে ৬০ হাজার ফিলিস্তিনিও প্রাণ হারিয়েছে, বাস্তুচ্যুত হয়েছে, তাদের কি হবে। তাদের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি পরিকল্পনা ,নেতানিয়াহুকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা করেছেন। পশ্চিম এশিয়ার গাজা ভূখণ্ডটি যেখানে ফিলিস্তানীয়রা বাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা অধিকার করবে এবং ফিলিস্তিনিয়দের শবদেহের উপর তিনি একটি প্রমোদ নগরী গড়ে তুলবেন। যেখানে বিশ্বের পর্যটকরা এসে বিলাসবহুল জীবনযাপন করবে। ফিলিস্তিনিও জনগণকে তিনি পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। তার এই বর্বরোচিত ঘোষণা, তাবৎ রাষ্ট্রনায়কদের এবং বিশ্বের নাগরিকদের হতচকিত করে দিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি তার এই পুনর্বাসন নীতি সমর্থন করছে না।

পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উচ্চাভিলাসী বর্বর ,রাষ্ট্রনায়কের মুখাপেক্ষী এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। রাষ্ট্রপতির ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার বৈঠকে নরেন্দ্র মোদীর তোষামোদপ্রিয়তা দেশের মাথাকে নত করে দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জয়লাভের পর ঘোষণা করেন আমেরিকা কে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাবার অন্যতম অস্ত্র পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন । সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন , ভারতের

আমদানি শুল্কের হার অত্যন্ত বেশি। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে, নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত অনেক পণ্যের উপর শুল্কের হার কমিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও মোদির সঙ্গে বৈঠকের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের শুল্ক নীতির সমালোচনা করেন।। মোদীজি কোন প্রতিবাদ করেননি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে মোদীজি, রাশিয়া এবং ইউক্রেন পরিভ্রমণ করেন। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধাবসানের উদ্দেশ্য নিয়েই তার এই বিদেশ সফর ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। মোদি জি ইউক্রেনে থাকাকালীন, রাশিয়া ইউক্রেনের হাসপাতালের উপর বোমা বর্ষণ করে । মোদি জি ইউক্রেন পরিত্যাগের পূর্বেই, জেলেনস্কি তার এই সফর সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য করেন। তৎ সত্ত্বেও মোদিজীর তোষামদ প্রিয় গোদি মিডিয়া তার শান্তি প্রয়াসের প্রশংসা করে। মোদীজি কে বিশ্ব গুরু আখ্যা দেয়। মোদীজিকে সাংবাদিকরা তার নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করলে, মোদীজি বলেন তিনি নিরপেক্ষ নন শান্তির পক্ষে।

বস্তুতপক্ষে শান্তির পক্ষে তো ইসরাইলের রাষ্ট্রপ্রধান নেতানিয়াহু ও বটে। তিনি শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই গাজা ভূখণ্ডের নিরীহ অধিবাসীদের উপর বোমা বর্ষণের নির্দেশ দেন। সম্প্রতি রিয়াদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান পুতিনের ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। সেখানে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপ্রধান জেলেনস্কিকে ডাকা হয়নি। অথচ দু দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এই আলোচনা সময় নরেন্দ্র মোদীর শান্তি প্রচেষ্টার কোন উল্লেখ ছিল না। খুব সম্প্রতি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপ্রধান জেলেনস্কি, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে। সেই বৈঠকে জেলেন্সকি তার জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার মতবিরোধ হয় এবং ট্রাম্প বেশ রুষ্ট হন। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও জেলেনস্কি মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির সামনে চোখে চোখ রেখে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু এই সাহস নরেন্দ্র মোদি দেখাতে পারেননি। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে তিনি তাকে খুশি করতে ব্যস্ত ছিলেন। চতুর্থ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নরেন্দ্র মোদী, ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখনো নরেন্দ্র মোদির ছাপোষা সংবাদ মাধ্যম তার প্রশংসার কোনো খামতি রাখেনি। অথচ সংবাদে প্রকাশ ,নরেন্দ্র মোদির আগে যারা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন , যেমন রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান বা জরডনের রাষ্ট্রপ্রধান, ট্রাম্প স্বয়ং এগিয়ে এসে তাদের সম্ভাষণ করে হোয়াইট হাউস এর ভিতরে নিয়ে যান। মোদিজীর ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি তার সচিব কে মোদীজি কে স্বাগত জানাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন।। একথা মোদিজীর তোষামোদি সংবাদ মাধ্যম কোথাও উল্লেখ করেনি।

গত সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি এজেন্সি ইউ এস এড ভারতকে ২১ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইউ এস এড, আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থা। United state agency for International Development ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষনার পর ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচার করতে শুরু করে আমেরিকা থেকে টাকা পাঠানো হয়েছে বিজেপিকে হারিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার জন্য। সংসদে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রোপাগান্ডা সেল প্রচার করতে শুরু করে করে এই টাকা কৃষক আন্দোলনে, ভিমা করেগাঁও আন্দোলনে ব্যবহার করা হয়। আরো যে সমস্ত বিজেপি বিরোধী আন্দোলন হয়েছে সেখানে ব্যবহার করা হয়।

আমেরিকা সরকারের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কোনো এজেন্সি থেকে টাকা এলে প্রথমে তা যাবে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে সেই টাকা যথাযথ স্থানে প্রেরণ করা হবে। এটা ভারতবর্ষের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এক্ট এর মধ্যে পড়ে। সুতরাং ভারত সরকারকে না জানিয়ে সেই টাকা, মোদী সরকারকেউৎখাত করার জন্য পাঠানো হবে, কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি অসত্য ভাষণের উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধীপক্ষকে আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে কয়েক দিনের মধ্যে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দু সহ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ইউএস এড এজেন্সি ভারতবর্ষে কোন টাকা পাঠায়নি। একুশ মিলিয়ন টাকা পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশ কে। বস্তুতপক্ষে ২০০৮ সালের পরে মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের ইউএস-এড সংস্থাটি ভারতকে কোন টাকা পাঠায়নি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতির আসনে ক্ষমতায় বসার পর সমস্ত বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব লীলা শুরু হয়েছে। তার সিদ্ধান্তগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। পানামা খাল নিয়ন্ত্রণ, ইউক্রেনের খনিজ সম্পদের উপর দখলদারী , গ্রিনল্যান্ডকে মার্কিন দেশের কবলে নিয়ে আসা, এ সমস্তই আসলে পুঁজিবাদী সংকট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পদক্ষেপগুলির ফলে পুঁজিবাদী সংকটের গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ❐

মার্কিনী অর্থ মোদীর ঘরে– মোদীর মুখোশ খুলে দিল তারই বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প

অমিতাভ সিংহ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে শুল্ক যুদ্ধে নেমেছেন। গত ক'বছর নাকি বেশ কয়েকটি দেশ বেশী শুল্ক চাপিয়ে আমেরিকাকে বঞ্চিত করেছে, তাই এই সিদ্ধান্ত। এরই মাঝে ট্রাম্পের আদানী ধন কুবের ইলন মাস্ক,যিনি ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সীর শীর্ষ কর্তা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি আমেরিকা

সরকারের কিছু খরচ ছাঁটতে গিয়ে বলে ফেলেছেন যে ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট বা সংক্ষেপে ইউএসএআইডি নাকি ভারতে ভোটের হার বাড়ানোর জন্য ২১ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল যা আর দেওয়া হবে না।এর পর ট্রাম্প এই খরচকে কিকব্যাক বা ঘুষ বলার পর বিজেপির আইটি সেল রে রে করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাজারে মিথ্যা প্রচারে নেমে পড়েছিল। তারা বলতে চেয়েছিল যে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য এই অর্থ বাইডেন প্রশাসন খরচ করেছিল।লোকসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় পর্যন্ত মাঠে নেমে পড়লেন এই বলে যে বিদেশী শক্তি দেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করছে যা অতীব উদ্বেগজনক এবং এর তদন্ত প্রয়োজন। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন যে এই ঘটনা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপ। এই ব্যাপারে বৈদেশিক দপ্তর তদন্ত করছে ও তা পরবর্তীকালে সব জানাতে পারবে বলে তিনি জানান। কিন্তু মোদী বা অমিত শাহ চুপটি করে বসে রইলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা উল্টে বিজেপির দিকে তিরের মুখটি ঘুড়িয়ে দিয়েছেন।তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন ১৯৯৩ সালে খোদ মোদী ইউএসএআইডির মদতপুষ্ঠ সংস্থার সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে বৈঠক করেছিলেন। কোভিদের সময় মোদী সরকার এই সংস্থার কাছ থেকে ১০ কোটি ডলার সাহায্য চেয়েছিল। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর উক্ত সংস্থার প্রধান সামান্থা পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ২০১৬ সালে নোটবন্দীর ঠিক একমাস আগে একই সংস্থা ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক যৌথভাবে ডিজিটাল অর্থব্যবস্থা পক্ষে প্রচার করেছিল। তার প্রশ্ন ছিল,তাহলে কি নোট বাতিল প্রকল্পে আমেরিকা টাকা ঢেলেছিল? আবার এদের দেওয়া টাকায় মোদী সরকার দেশের ৭৩ টি শহরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালিয়েছিল।এমনকি নরেন্দ্র মোদী লোকসভা ভোটের আগে উক্ত সংস্থার প্রাক্তন কর্তা রাজীব শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কি জন্য? পবন খেরা বলেন ১৯৭৫ - ৭৭ সালে ইন্দিরাজির সরকারের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনকে মদত দেওয়ার জন্য মার্কিন অর্থ বিনিয়োগ করা হয়।।১৯৮৯ সালে রাজীবজির বিরুদ্ধে এবং ২০১২ সালে আন্না হাজারের পিছনে মার্কিন অর্থ এসেছিল। পবন খেরা বলেন মোদী সরকার সাহস থাকলে শ্বেত পত্র প্রকাশ করুক।

এসবের মধ্যেই দাবী করা হল ২০২২ সালে ৩১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয় বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশের গত নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক লাভের জন্য ১৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার পর কংগ্রেস দ্বিগুণ উদ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে কামান দাগে। তারা অভিযোগ করে যে আরএসএস চিরকাল আমেরিকার কাছ থেকে মদত পেয়েছে। জরুরি অবস্থার সময়কার ঘটনা তো অনেকের জানা। এরই মাঝে ট্রাম্প উল্লেখ করেছেন যে এই অর্থ (তার কথায় কিক ব্যাক) তার বন্ধু মোদীর জন্য দেওয়া হয়েছিল। এব্যাপারে বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবীয় একেবারে স্পিকটি নট। কারণ তার কাছে কোন জবাব নেই। কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা প্রশ্ন তুলেছেন দেশের গোয়েন্দা দপ্তর তখন কি করছিল যখন প্রতিবেশী দেশে আমেরিকা টাকা ঢালল আর তারা এর কোন খবর পেল না? বিজেপি যে দাবী করেছিল ২০১২ সালে ইউএসএআইডির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের চুক্তি হয় ।সেই টাকা কার জন্য দেওয়া হয়েছিল যার ফলে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে কংগ্রেস সরচেয়ে কম আসন ৪৪ টি পেল আর বিজেপি ২৮২ টি আসন পেল। দেশে বিদেশী তহবিল ঢোকার ব্যাপারে কঠিন আইন আছে,তাসত্ত্বেও দেশের সরকার কি তার কোন খোঁজ পায় নি? কংগ্রেস একটা শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী করেছে। এক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হচ্ছি এই সরকার শুধু অকর্মণ্য বা অপদার্থ নয়, মিথ্যাবাদীদের সরকার।

আমেরিকার সরকার ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে আর তা নিয়ে বিজেপি মিথ্যা খবরকে প্রশ্রয় দিয়ে পাল্টা বিরোধীদলকে নিশানা করছে এরকম ঘটনা দেশের গণতন্ত্রে নজিরবিহীন। এই ঘটনা বিজেপির দেশভক্তি নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল না কি? আমেরিকার এই বক্তব্যর কোন প্রতিবাদ সরকারি স্তরে না হওয়াটা অত্যন্ত অপমানজনক তা মোদী কোম্পানির চেতনা কবে হবে? আসলে মোদী তার মেন্টর গৌতম আদানিকে বাঁচাবার জন্য শিরদাঁড়াটাই বিকিয়ে দিয়েছেন।

আসলে যাদের মেরুদণ্ডটি বিক্রি হয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে কি আর আশা করা যায়। অর্থমন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট বলছে ২০২৩-২৪ সালে ইউএসএআইডি মোদী সরকারের সঙ্গে মিলে ৭৫ কোটি ডলারের প্রকল্প রূপায়ন করেছে যার মধ্যে ভোটের হার বাড়ানোর কোন প্রকল্প নেই।

ইউএসএআইডি হচ্ছে আমেরিকা সরকারের একটা স্বাধীন সংস্থা যারা বিভিন্ন দেশে উন্নয়নে সহায়তা করে। এরা বিভিন্নসময়ে আরএসএসকে সাহায্য করেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ন যখন আরএসএসকে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কে মসনদ থেকে সরাবার জন্য আন্দোলন বা চক্রান্ত করছিলেন তখন আমেরিকা তাদের ঢালাও ভাবে সব কিছু দিয়ে সাহায্য করেছিল। মূলত বাংলাদেশ গঠনে সাহায্য করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে বার বার সিআইএ হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন আরএসএস কি তাদের সাহায্য করে নি। ২০১২ -১৩ সালে মনমোহন সিং সরকারের সময় আন্না হাজারে আরএসএস এর সহায়তায় যে আন্দোলন করেছিল তার পেছনে কলকাঠিও নেড়েছিল আমেরিকা ও এই ইউএসএআইডি। তাদের অর্থ সরকার উৎখাতের আন্দোলন ও মিথ্যা প্রচারে ব্যয় করা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পিযুষ গয়াল ও স্মৃতি ইরানীর সঙ্গে এই সংস্থার যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। স্মৃতি ইরানী তো এদের একটি প্রকল্পের দূত হিসাবে কাজ করেছেন। নোটবন্দীর একমাস আগে ডিজিটাল লেনদেনের প্রচারে এই সংস্থার টাকা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন সময় বিরোধী দলগুলিকে

দূর্বল করা,সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সংগঠনগুলিকে দূর্বল করার জন্য বিদেশী তহবিল যে বারবার ব্যবহার করা হয় তা জলের মত পরিষ্কার।

বিদেশী অর্থ ভারতের নির্বাচনে কতটা ব্যবহার করা হয়েছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা সরকারের একান্ত কর্তব্য। ২০১৬ সালে ট্রাম্পের জয়ে বিদেশী সাহায্য নেওয়ার অভিযোগ সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয় দফার পর আমেরিকার গণতন্ত্র, মানবাধিকার সব ভেঙে পড়েছে। ভারতও কি সেই পথের পথিক?❐

বাংলাদেশে এবারের মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন : অমর ২১ ফেব্রুয়ারি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।প্রতি বছরই অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে আমরা যেমন এই দিনটি এপার বাংলায় ও বিভিন্ন রাজ্যে পালন করে থাকি, তেমনি বিভিন্ন দেশেও এই দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। কিন্তু আমরা যারা বাঙালি,যাদের এই দিনটার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার একটা আবেগ তৈরি হয়,তাদের নজর থাকে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের উপর। এই দিন উদযাপনে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছেই একটা বাড়তি গুরুত্ব পায়। সে দেশের ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার স্বীকৃতি এনে দেয় নি, দিয়েছে স্বাধীনতা। ভাষা আন্দোলন পরিণত হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনে।ফলত ফেব্রুয়ারির ২১,বাংলাদেশের মানুষের কাছে কেবলই একটা উদযাপন নয়,ফেব্রুয়ারির ২১ বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার দিন।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও এ রাজ্যে নিজেদের মতো করে যেমন এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি, তেমনি ওপার বাংলার মানুষের সাথে একাকার হয়ে দিনটি উদযাপনে সামিল হই।বাংলাদেশ সীমান্তে ২১-এর সকালে দুই দেশের মানুষ সমবেত হন।শ্রদ্ধা জানানো হয় ভাষা শহীদদের। ভাষাই যেন দুই দেশ কে সেদিন এক করে দেয়। এবারের ২১ ফেব্রুয়ারি কি সেই ঐতিহ্য নিয়েই আমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারল ? দুই বাংলার মানুষের মধ্যে এবারে ছিল যথেষ্ট সংশয়।বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দুই বাংলার মানুষের মধ্যে এই সংশয় তৈরী করেছিল।বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু মৌলবাদী শক্তি বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ কে শুধু বিনষ্টই করেনি,সে দেশের সুস্থ শিল্প-সংস্কৃতির চর্চায় এনেছে আঘাত। আক্রান্ত সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা।

আশঙ্কা যেন সত্যিই হল।২১ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ - এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই দিনটি উদযাপন কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অশান্তির খবর এল সাধারণ মানুষের কাছে।ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও এই দিনটাকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী সহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানে পরিলক্ষিত হল স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব।অনেক জায়গাতেই এই আয়োজন যান্ত্রিকতায় ও নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হল। দিনটি পালনের ক্ষেত্রে শাসকদের অনীহা ও বিরক্তির আভাস স্পষ্ট। বাংলাদেশের বহু জায়গায় এই দিনটি পালনে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আয়োজকদের। প্রথা অনুসারে আগেরদিন মাঝরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিন ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। কিন্তু তাঁরা এক সঙ্গে যাননি। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি।উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

২১-এর সকালেই সাদা কালো পোশাকে শহীদ মিনার চত্বরে জমায়েত হন বহু সংখ্যক মানুষ।দিনের বেলায় দফায় দফায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।কিন্তু আগস্ট ২০২৪ থেকে ঘটে চলা নানা ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেলেন না আওয়ামী লিগ,ওয়ার্কার্স পার্টি সহ ১৪পার্টির জোট শরিকের নেতৃত্ব।

অপর দিকে ২১ তারিখ ভোর রাতে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় গুণবতী কলেজে শহীদ মিনার ভাংচুর করার অভিযোগ পাওয়া যায়। যশোরের কামিনীডাঙ্গা হাইস্কুল দখল করে সরকার সমর্থকরা সেখানে একপাশে থাকা শহীদ মিনারটি ভেঙে সেখানে একটি প্রস্রাবাগার বানিয়েছে।অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে প্রদর্শিত 'অমর একুশ' -এর প্ল্যাকার্ডে একাধিক বানান ভুলের ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

চট্টগ্রামে ,আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি আবৃত্তির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই সময় একটি কবিতা পড়ার সময় বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ হওয়ায় মাঝ পথেই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিএনপি ঘনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সংস্থার কিছু নেতা ও কর্মীসেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অনুষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেয়। সেখানে আবৃত্তি শিল্পীকে হেনস্থা করার ঘটনাও ঘটে। আবৃত্তি শিল্পীর অপরাধ তিনি তার কবিতায় কয়েকটি লাইনে 'বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা', 'একাত্তর', 'সাতই মার্চ', 'মাওলানা ভাসানী' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি শিল্পীকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়।

নানারকম বাধা সৃষ্টি সত্ত্বেও ২১ শে উদযাপন হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্র লীগের (আওয়ামী লীগের ছাত্র শাখা) সদস্যরা গেরিলা কায়দায় সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা শহীদ মিনার গুলিতে শেষ রাতে গিয়ে শহীদদের স্মরণে ফুল দিয়ে এসেছেন। কোথাও কোথাও তাঁরা বিএনপি ও জামাতের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ফুল দিতে গিয়ে এক ছাত্র লীগ কর্মী বিএনপি নেতা বশিরুদ্দিন ও তাঁর দলবলের হাতে আক্রান্ত হন। ওই ঘটনার ছবি তুলতে গিয়ে এক সাংবাদিকও প্রচণ্ড মার খান। তাঁর ক্যামেরা ও মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়।

বীর ভাষা শহীদদের স্মরণ উদীচীর

মবতন্ত্র এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর আঘাত প্রতিরোধ করার প্রত্যয় নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে'র নেতৃত্বে প্রভাতফেরিতে অংশ নেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ এবং ঢাকা মহানগরের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখা সংসদের নেতা-কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বীর ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রধান ফটকের সামনে উন্মুক্ত সড়কে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে উদীচী। উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে। তিনি বলেন, 'মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। রফিক, শফিক, জব্বার, সালাম, বরকতের আত্মবলিদান শুধু মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকারই ছিনিয়ে আনেনি, স্বাধিকারের সংগ্রামে পুরো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একুশের হাত ধরেই পরবর্তীতে শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা, ৬৯'র সফল গণঅভ্যুত্থান শেষে ১৯৭১-এর সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ। তাই, যতদিন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি থাকবে, ততদিনই বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি প্রবীর সরদার এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত হয় গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও পথনাটক। সমবেতভাবে তআমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারিদ এবং ত্তধন ধান্য পুষ্প ভরাদ গান দুটি পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সঙ্গীত বিভাগের শিল্পীরা। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্পনা খান ও জয়া সেন গুপ্তা। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে স্বরচিত পুঁথি পাঠ করেন তুষার চন্দন। বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় আবৃত্তি বিভাগের বাচিক শিল্পীরা। একক নৃত্য পরিবেশন করেন উদীচী গেন্ডারিয়া শাখা সংসদের শিল্পী, তামান্না সিদ্দিকা নীলা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে পরিবেশিত হয় পথনাটক অমুখোশদ। নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন নাজমুল হক বাবু। নাটকটিতে গত কয়েক মাস ধরে মাজার, লালন আখড়া, মন্দিরে হামলা, মব সৃষ্টি করে বইমেলায় স্টল বন্ধ করা, বসন্ত উৎসব ও লালন উৎসবসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে বাধা দেয়াসহ বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা হয়। সংস্কৃতিবিরোধী এসব অপশক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বানও জানানো হয় এ পথনাটকে। উদীচীর এবারের আয়োজনের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়-- 'একুশ মানে চেতনায় ধার, আসবে আলো কাটবে আঁধার'। ❐

এপার বাংলায় স্মরণ ভাষা শহীদদের

প্রসেনজিৎ দত্ত

---

২১ ফেব্রুয়ারি এপার বাংলায় রাজ্য সরকারসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্মরণ করা হয় ভাষা শহীদদের।

এই উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানটি হয় দেশপ্রিয় পার্কে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ' অন্য দেশ সম্পর্কে বলা উচিৎ নয়। আমি আমার নিজের দেশ সম্পর্কেই বলব। বাংলা হাজার বছরের পুরোনো ভাষা। এখন তা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে।' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগই যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভিত্তি ওই বিষয় এই অনুষ্ঠানে অনুল্লেখিত ছিল।

এদিন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (NBA)অনেকগুলি কর্মসূচি নিয়েছিল। NBA মহাবোধি সোসাইটিতে 'ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বিনিময়' বিষয়ে যে আলোচনার আয়োজন করে তাতে প্রবীণ নেতা বিমান বসু বাঙলা দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সভায় ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। কবিগুরুর চিন যাত্রার একশো বছর উপলক্ষ্যে তাঁর ' জাপান যাত্রী' থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করেন NBA ' র অধিকর্তা অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশের দিন উপলক্ষ্যে আলোচনায় সুজন চক্রবর্তী বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন' বাঙালির জাতিসত্ত্বা, ভাষা , সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' এখানে বিধানসভায় মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে আলোচনা গৌণ। আলোচনা হচ্ছে কে বেশি হিন্দু , আর কে কত ক্রনি কাপিটালিস্টদের কাছে তাই নিয়ে । পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর বিধান ভবনে আয়োজিত কর্মসূচিতে 'বঙ্গ জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ' বিষয়ে আলোচনা করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনের সিনেট হলে' ২১শে ফেব্রুয়ারি-২৫' বেলা ৩টা থেকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ দিলীপকুমার সিনহা, সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চের কেন্দ্রীয় সভাপতি। অনুষ্ঠান উদ্বোধণ করেন অধ্যাপিকা শান্তা দত্ত (দে), মাননীয় উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক পার্থ বন্দোপাধ্যায় এবং মুখ্যবক্তা ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য তৎসহ অধ্যাপক

সনৎকুমার নস্কর ডিন কলা বিভাগ, অধ্যাপক দেবাশিস দাস নিবন্ধক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দৈনিক কালান্তর সম্পাদক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ। সূচক বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক, ভাষা মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নীতীশ বিশ্বাস ।

নানা ভাষার শতাধিক কবিদের অংশগ্রহণে সর্ব ভাষা কবি সম্মেলন সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা যূথিকা পাণ্ডে ও কবি দিলীপ পাল । উপাচার্য বলেন 'আমার ভাষা বাংলায় আমি বেশি কথা বলতে স্বচ্ছন্দবোধ করি। এবং যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে যখন বক্তব্য রাখতে যাই সেখানেই আমি বাংলা ভাষায় বেশি বেশি করে বলবার চেষ্টা করি । ভাষা অগ্রাসন আমি কখনোই পছন্দ করি না । আঞ্চলিক ভাষাগুলো আজ যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা আমাকে কষ্ট দেয় । তিনি তুলে আনেন টোটো ভাষা এবং বউ ভাষার কথা। যে বউ ভাষায় আর মাত্র একজন বেঁচে আছেন । এখন সেই বিধবা নারী একটি টিয়া পাখিকে সেই বুলি শেখাচ্ছেন।' ❐

নরেন্দ্র মোদীর আস্ফালনের পতন

সায়কঘোষচৌধুরী

নরেন্দ্র মোদী ভারতের ক্ষমতায় এসেছিলেন 'আচ্ছে দিন'-এর কথা বলে। সেই আস্ফালনের 'একে একে নিভেছে দেউটি'... অন্য 'দেউটি' গুলো আগেই নিভেছে। শুধু পড়ে ছিল, 'নরেন্দ্রমোদী থাকলে শেয়ার মার্কেট বাড়বে', এই আস্ফালনটি। সেই দেউটিও নিভে গেলো।

শুধু ২৮ফেব্রুয়ারী সকালবেলার পতনেই Nifty থেকে ৬ লক্ষ কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে। শুধু ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব ধরলে Nifty তে ৫% পতন হয়েছে , যা Nifty -র ইতিহাসে ২৮ বছরে এই প্রথমবার। 'পরপর ৫ মাস ধরে Nifty-তে পতন' ভারতের শেয়ার বাজারের ইতিহাসে মাত্র ২ বার হয়েছে। ১৯৯০ আর ১৯৯৬ সালে। দুইবারই অ-কংগ্রেসি সরকার ছিল। Nifty ৫০০ শেয়ার গত ১ বছরে average ৩০-৬৮% পড়েছে। ১ বছর আগে কেউ শেয়ার মার্কেট Nifty-তে টাকা রাখলে গত ১ বছরে কোনো টাকা রোজগার করতে পারেননি। জানুয়ারী মাসেই ভারতের শেয়ার বাজার থেকে বেরিয়ে গেছে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। বা ৫২০ বিলিয়ন ডলার। এই বেরিয়ে যাওয়া টাকা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নরওয়ে, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়ার অর্থনীতির চেয়ে বড়।

এমনিতে শুরুর ভুলটা হলো, 'নরেন্দ্র মোদীর সময় ভারতের শেয়ার বাজার সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছে'... এটি সত্যি নয়। ১৯৯০-২০০০, ২০০০-২০১০ ভারতের শেয়ার মার্কেটে বৃদ্ধি ১০% এর উপরে ছিল। নরেন্দ্র মোদীর সময়ে সেটি ৮.৮% ...২০২০-২০২৩ সালের যে 'বৃদ্ধি'-টা দেখিয়ে নরেন্দ্র মোদী আস্ফালন করেন, সেটি কিন্তু ২০১৮-১৯-এর পতনের পরে এসেছিলো। সেনসেক্স ৫০,০০০ থেকেনেমে Covid-এর সময়ে ২৬,০০০ হয়েছিল। তারপরে ৭৫,০০০-এ গেছিলো। পুরো নরেন্দ্র মোদীর সময়ের হিসাব ধরলে Nifty -র return ৮.৮%-এর বেশি নয়। যা Fixed Deposit থেকেও পাওয়া সম্ভব।

ধরা যাক, কেউ ১৯৯০ সালে ১০০ টাকা শেয়ার মার্কেটের Nifty Index-এ রেখেছিলেন। ২০০০ সালে সেই টাকা তাঁর ৭০০ টাকা হয়ে গেছে, উনি সেই টাকা শেয়ার মার্কেট থেকে না তুললে এবং সেটি (হর্ষদ মেহতা, কোয়ালিশন সরকারের অস্থিরতা, asian financial crisis– IT Meltdown সব সহ্য করেও)। কিন্তু কেউ যদি ২০১৪ সালে শেয়ার বাজারের Nifty Index-এ ১০০ টাকা রেখে থাকেন, ২০২৫ সালে তাঁর টাকা ২৩০ টাকা হয়েছে। উনি fixed deposit -এ রাখলেও ওই টাকা পেতেন। এই পুরো সময়টায় নরেন্দ্র মোদীকে চিদাম্বরমের সময়কার "Asian Financial Crisis", বাজপেয়ীর সময়কার "IT Meltdown" বা ডঃ মনমোহন সিংহের সময় 'Global Recession' সামলাতে হয় নি। Crude Oil -এর দাম ঐতিহাসিকভাবে কম ছিল। কোনো কোয়ালিশন সরকারের ঝক্কি পেরোতে হয়নি।

তাহলে নরেন্দ্র মোদী ভারতের অর্থনীতির পক্ষে একের পর এক বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ? যে শক্তিকান্ত দাস Reserve Bank-এর গভর্নর পদ থেকে অবসর নিলেন, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় সচিব বানিয়ে দেওয়া হলো কেন ? কাদের নিয়ে নরেন্দ্র মোদী অর্থনীতি চালাচ্ছেন ?

এই শেয়ার মার্কেটের রেকর্ড পতনের কারণ কী ?

প্রথম কথা হলো, 'গোদি মিডিয়া' এই পুরো শেয়ার মার্কেটের পতনটিকেই undermine করে দেখাতে চাইছে। কোনো mainstream media যাকোনো না কোনো 'গোদি শেঠ'-এর কেনা , এটা দেখাতেই ভয় পাচ্ছে যে, মোদী সরকারের প্রধান 'কৃতিত্ব' অর্থনীতির হালই খাস্তা। ফলত হাবিজাবি অনেক হিসাব নিকাশ দেওয়া হচ্ছে।

'ট্রাম্পের জন্যে হয়েছে'। 'ডলার বেড়ে গেছে বলে হয়েছে'

"economic slow down-এর ফলে হয়েছে' এগুলোর একটাও সত্যি নয়। ট্রাম্পের জন্যে 'বিশ্বগুরু'-এর কি সমস্যা হয়েছে যা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে হয়নি ? আসলে নরেন্দ্রমোদী সেই গুজরাতি ফাটকাটা খেলতে গেছেন পুরো ভারতের অর্থনীতি নিয়ে যা ওঁর আগে হার্শাদ মেহতা বা কেতন পারেখ খেলতে সক্ষম হন নি।

(১) নরেন্দ্র মোদী কোথাওথেকেশুনেছেন যে, ভারতের ২৯ বছর median age ভারতকে demographic dividend দেবে। ২০২২ থেকে ২০৪৭ অব্দি। তাই উনি 'অমৃতকাল' শব্দবন্ধটি coinage করেছেন। কিন্তু ওঁর এই demographic dividend বা জনসংখ্যার লাভে কোনো কৃতিত্ব নেই। এবং ওই 'অমৃত কাল' আসতে কি কি করতে হবে উনি সেই কর্তব্য গুলি অবহেলা করেছেন। উনি শেয়ার মার্কেটের ফাটকাবাজদের মতোই 'আগাম লাভ' গোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের মূল সমস্যা হলো, ভারতের ১৪৫

কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১২-১৩ কোটি মানুষই আছেন যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা আছে। বাকিদের কোনো ক্রয় ক্ষমতা নেই। ডঃ মনমোহন সিংহ ২৭ কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমার উপরে তুলে এনেছিলেন। তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াচ্ছিলেন। নরেন্দ্র মোদী তাঁদের চাকরি বাকরি খেয়ে তাঁদের আবার দারিদ্রসীমার নিচে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বরং তিনি corporate লাভের উপরে বেশি ভরসা করছেন।

'আদানী -আম্বানি- পতঞ্জলি বাড়লেই ভারতের উন্নতি'

এর ফলে ভারতের অর্থনীতি শুধু শেয়ার বাজার বাড়িয়ে তোলা যাচ্ছে না। মানুষ জিনিস কিনলে তবেই তো অর্থনীতি বাড়বে। আপনি পুরো টাকা কয়েকজন গুজরাতি শিল্পপতির হাতে জড়ো করলে কি হবে ? luxury item-এর বিক্রি বাড়বে। কিন্তু সাবান-বিস্কুট FMCG পণ্য কেনার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নরেন্দ্রমোদী পুরো ভারতথেকে চাকরি হাওয়া করে দিয়েছেন। ডলারের দাম বাড়তে দিয়েছেন। "export বাড়বে" যুক্তি দিয়ে। কিন্তু export করার জন্যে software বানাতে গেলেও computer material বাইরে থেকে import করতে হয়। ডলার বাড়লে import ব্যয়বহুল হয়। নরেন্দ্র মোদীর "Make in India" প্রকল্পটিই ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ভারতে manufacturing sector ঠিকভাবে তৈরি হয়নি। আর Manufacturing Sector তৈরি না হওয়ার পেছনে গুজরাতি ব্যবসায়ীদের "trading" মানসিকতা দায়ী। ওঁরা নিজেরা কিছু বানাতে চান না। কম ঝুঁকিতে কাজ করেন। মধ্যসত্বভোগী। 'কেউ বানাবে, কেউ কিনবে, আমি মাঝে দালালি খাবো।'

ভারতের 'অর্থনৈতিক বৈষম্য' এমন জায়গায় নরেন্দ্র মোদী নিয়ে চলেগেছেন যে ধনী ব্যক্তিকে quality of life খুঁজতে গেলে বিদেশে যেতে হবে। আর বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ জীবনে কোনো সম্ভাবনা খুঁজে না পেয়ে সব বিষয়ে মারামারি করবে। 'হিন্দু - মুসলিম', 'মন্দির- মসজিদ', 'দলিত-ব্রাহ্মণ', 'রাম নবমী'.... 'নরেন্দ্রমোদী ঠিক না ভুল' সেই নিয়েও মারামারি চলবে। মানুষের জীবনযাত্রার মান নরেন্দ্র মোদীর সময় খারাপ হয়েছে। ঐদিকে মিডিয়া খুললে সেটা বোঝা যায় না। অন্য কোনো কিছুই চলছে সেখানে। চীন Deep Seek বানিয়ে Nvidia-র শেয়ার ফেলে দিচ্ছে। ভারতের তেমন কোনো product -ই নেই।

(২) নরেন্দ্র মোদী শেয়ার মার্কেট পুরোটাই ছেড়ে দিয়েছেন আদানীর নিয়ন্ত্রণে। এখানে SEBI-র চেয়ারপারসন মাধবী পুরী বুচকে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও পদে নিয়োগ করা হয় যাতে আদানী এবং বিজেপির গুজরাতি operator -দের বিরুদ্ধে তদন্ত না হয়। আদানীকে round tripping -এর সুবিধা করে দিয়েছেন। যখন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা মাধবী পুরী বুচ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, বিজেপির সাংসদরা মারতে চলেআসেন। যেন মাধবী পুরী বুচ কে বাঁচানোও ওঁদেরই দায়িত্ব। যেখানে লড়াইটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বাঁচানোর। নরেন্দ্র মোদীই ভারতের সেই প্রথম প্রধানমন্ত্রী আর অমিত শাহই ভারতের সেই প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাঁরা দেশের সাধারণ মানুষকে শেয়ার মার্কেটের টাকা বিনিয়োগ করতে জোরাজুরি করেছিলেন। ঐদিকে নরেন্দ্র মোদীর পুরো সময়টাতেই সোনা বা fixed deposit-এর মতো safe investment শেয়ার মার্কেটের চেয়ে better perform করেছে। সারা পৃথিবীতে শেয়ার মার্কেট বাড়ছে। ভারতে নরেন্দ্র মোদী ফেলে দিচ্ছেন কি করে ? একমাত্র থাইল্যান্ড বাদ দিয়ে বাকি সব এশিয়ান মার্কেট ভারতের চেয়ে ভালো perform করছে। এমনকি করাচি স্টক এক্সচেঞ্জও !

এখন আসল প্রশ্ন হলো—
শেয়ার মার্কেটের সাধারণ বিনিয়োগকারী কি করবেন ?
দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, 'শেয়ার মার্কেট কি আরো পড়বে ?'
উত্তর হলো—

(১) শেয়ার মার্কেট ১৫%-এর নিচে সাধারণতঃ পড়ে না। বিশ্বে financial meltdown -এর কোনো খবর নেই। তাই ২৬,০০০ এর উপর থেকে শুরু করে ২২,০০০ এর নিচে শেয়ার মার্কেট খুব বেশি যাবে বলে মনে করি না। corporate earning report খারাপ নয়। ওই '৯০ ঘন্টা কাজ করো', '১৫০ ঘন্টা কাজ করো'-র ফলাফল ফলেছে। corporate results আমি কোথাও খারাপ দেখিনি। IT-তে ডলার নিয়ে confusion আছে। বাকি জায়গায় invested থাকলে ক্ষতি নেই। small cap এড়িয়ে যেতে হবে। PSU bank safe bet .

(২) সেপ্টেম্বর থেকে মে - ৮ মাসের একটা সময় আছে। এটা একটা downward cycle ... এপ্রিল মাসের পরে নতুন আয়কর নিয়ম লাগু হবে। ফলে মে মাসের পরে শেয়ার বাজার আবার বাড়তে পারে। কিন্তু retail investor বা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা যে সম্পদ হারালেন সেটি কি আর ফেরত আসবে ? উত্তর অনেকে covid-এর পরে Future and Option (F &O)-তে invest করেছিলেন। ৯৯% টাকা লুটে গেছে। SEBI -র হিসাবে ৯৩% ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী টাকা হারিয়েছেন শেয়ার মার্কেটে। নরেন্দ্র মোদীর কারণে। সরকার জানতো যে market manipulate হচ্ছে। retail investor বা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বাঁচাতে সচেষ্ট হয় না কেন ? এই যে বিনিয়োগকারীদের confidence-এ আঘাত লাগলো, এর ক্ষত দীর্ঘমেয়াদি। হয়তো বা চিরস্থায়ী।

প্রখ্যাত বিনিয়োগকারী দেবিনা মেহেরার ভাষায় , 'যদি কোনো শেয়ার ৮০% পড়ে যায়, আর তারপরে পরপর ৩ বছর ৫০% চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়লেও পুরানো valuation -এর মাত্র ৭০% দামে পৌঁছয়।'❐